দাম : ষোলো টাকা

শ্বাসকষ্ট হলে নিজে
ডাক্তারি করবেন না
— পৃঃ ২৩

স্বস্তিকা

তসলিমার ‘লজ্জা’ ও
আজকের বাংলাদেশ
— পৃঃ ১১

৭৫ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা।। ২ জানুয়ারি, ২০২৩।। ১৭ পৌষ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

বাড়ছে ফুসফুসের সংক্রমণ

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ১৮ সংখ্যা, ১৭ পৌষ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

২ জানুয়ারি - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

'মমতা' কিন্তু 'মেসি' নন তাই শেষ রক্ষা অসম্ভব □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

মাত্র তো পাঁচশো কোটি টাকা! ফিরিয়ে দাও না দিদি? □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

বিলাওয়াল ভুট্টো তার নিকৃষ্ট মানসিকতারই পরিচয় প্রকাশ করেছেন □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ৮

যিশু সম্পর্কে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হওয়া প্রয়োজন □ বরুণ মণ্ডল □ ১১

চীনের কোভিড-তথ্য গোপন আগামী পৃথিবীর জন্য ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনবে □ বিশ্বামিত্র □ ১০

তসলিমার 'লজ্জা' এবং আজকের বাংলাদেশ □ কৌশিক কর্মকার □ ১১

অভিন্ন নাগরিক বিধি সফল করে তোলা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য □ পার্থসারথী দেববর্মণ □ ১৪

শ্রীলঙ্কায় রাবণ কোনো ভাবেই ভিলেন নন □ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ১৫

হাজি মহম্মদ মহসিনের দানধ্যানের সবটাই মুসলমানদের জন্য □ বিনয়ভূষণ দাশ □ ১৭

শ্বাসকষ্ট হলে নিজে ডাক্তারি করবেন না □ স্বপন দাস □ ২৩

শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম □ গোপাল চক্রবর্তী □ ৩১

শুধু অঙ্কের জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন শ্রীনিবাস রামানুজন □ দীপক খাঁ □ ৩৩

পশ্চিমবঙ্গকে পিছন দিকে এগিয়ে দিয়েছে তৃণমূল □ জাহ্নবী রায় □ ৩৫

ঔপনিবেশিক প্রভাবকে সনাতনী সৌকর্যে অতিক্রম করবে ভারত □ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ও অরিত্র ঘোষ দস্তিদার □ ৩৬

ড. আম্বেদকর চেয়েছিলেন ভারত পাকিস্তানের মধ্যে জনবিনিময় হোক □ প্রণব দত্ত মজুমদার □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ □ □ খেলা : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮ □ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে ৯ জানুয়ারি ২০২৩

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৯ জানুয়ারি ২০২৩

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতে ফিরতে চায় পিওকে

পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মানুষ অনেকদিন ধরেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। গত সাড়ে সাত দশকে এই অঞ্চলের মানুষদের প্রতি পাকিস্তানের শাসকের বঞ্চনার কথা তো তারা বলছেনই, সেই সঙ্গে তারা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ভারতে ফিরে আসার দাবিও তুলছেন। ভারতের মানুষও চান এবার পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হোক। কিন্তু এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কী ভাবছে? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কী ভাবছেন? এই নিয়েই স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা। লিখবেন, নিখিল চিত্রকর, ড. রাজলক্ষ্মী বসু, সন্দীপ চক্রবর্তী প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড নম্বর-সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শুধু সাবধানতা প্রয়োজন

পুনরায় করোনার চোখরাঙানি শুরু হইয়াছে। তবে আমাদের দেশে নহে। করোনা নূতনভাবে বিএফ সেভেন রূপে হাজির হইয়াছে চীনদেশে। তাহারই দাপটে কাঁপিতেছে সমগ্র চীন। দ্রুত বিস্তার করিতেছে এই নূতন উপরূপ। আমাদের দেশেও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে দেশবাসীকে সতর্ক করা হইয়াছে। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে সাংসদ, মন্ত্রী ও আধিকারিকদিগেরও মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল। সতর্ক হইয়াছে রাজ্য সরকারগুলিও। অবস্থা এতই ভয়াবহ যে চীনদেশে শুরু করিতে হইয়াছে লকডাউন। আমাদের প্রধানমন্ত্রী জানাইয়াছেন, ভারতে এখনো পর্যন্ত লকডাউন ঘোষণার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং আতঙ্কিত হইবার কোনো কারণ নাই।

বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন, আতঙ্কিত হইবার কারণ না থাকিলেও পূর্ণমাত্রায় সতর্ক থাকিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। চীন হইতে ভারতে সংক্রামিত হইতে বিলম্ব হইবে না। এখন শীতকাল শুরু হইয়াছে। শীতকালে বায়ুদূষণের মাত্রা স্বাভাবিকভাবেই অধিক হইয়া থাকে। আর করোনা পরিস্থিতির কারণে বাহিরের হইতে ঘরের ভিতরের দূষণ বয়স্ক ও শিশুদের পক্ষে খুবই বিপদের। এই সময় শীতের জন্য ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া রাখা হয়। এইক্ষেত্রে বায়ু চলাচলের জন্য একটুকু ফাঁক রাখা খুবই প্রয়োজন। বদ্ধ ঘরে ধূপধুনা, মশা মারিবার কয়েল জ্বালানো অথবা রুম ফ্রেশনার স্প্রে করা খুবই বিপজ্জনক। ইহা ছাড়াও শীতকালে ফুলের পরাগ, লেপ-কম্বল, পোশাকপরিচ্ছদের ধূলিকণা, বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা, বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়া এবং ছত্রাক জাতীয় বিভিন্ন অণুজীবের আধিক্য দেখা দিয়া থাকে। ইহাতেই মানুষের বিশেষ করিয়া বয়স্ক ও শিশুদের শ্বাসকষ্টজনিত বিভিন্ন প্রকারের অসুখবিসুখে আক্রান্ত হইবার প্রবল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন, প্রবল ঠাণ্ডায় কষ্ট হইলেও ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালানো কোনোমতেই ঠিক নহে। যাহাদের শয়নকক্ষের মধ্যেই রন্ধনাদি কার্য সম্পন্ন করিতে হয় তাহাদের অন্ততপক্ষে একটি জানালা খুলিয়া রাখিতেই হইবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ঘরের ভিতরের বায়ুদূষণেই প্রতি বৎসর পৃথিবীতে ৪৩ লক্ষ মানুষের জীবনদীপ নির্বাপিত হইয়া থাকে। তাই এইসব বিষয়ে সচেতন থাকিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। বায়ুদূষণে কলকাতার অবস্থাও উদ্বেগজনক। আবহাওয়াবিদদের মতে, বিগত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর শীতকালে কলকাতায় বায়ুদূষণের মাত্রা ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সেইজন্য সারা বৎসর সুস্থ থাকিবার জন্য সাধারণ স্বাস্থ্যবিধিগুলি কঠোরভাবে পালন করিবার কথা তাঁহারা বলিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, শীতকালে বায়ুদূষণের ফলে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ যেইরূপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সেইরূপ রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতাও দুর্বল হইয়া পড়ে। শ্বাসকষ্টের জন্য বয়স্ক ও শিশুদের এই সময় ইনহেলারও ব্যবহার করিতে হয়। রোগ প্রতিরোধে ভিটামিন ডি-এর একটি বড়ো ভূমিকা রহিয়াছে। চিকিৎসকদের মতে, শহরাঞ্চলের শিশুদের ভিটামিন ডি-এর অভাব খুবই প্রকট। রৌদ্রের অভাবে ট্যাবলেট খাইয়া ইহাদের তাহার অভাব পূরণ করিতে হয়। শীতকালে রৌদ্রতাপ গ্রহণ করিলে বয়স্ক ও শিশুরা শ্বাসকষ্টের মতো রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। একটি সমীক্ষায় জানা গিয়াছে, বিশ্বব্যাপী বায়ুদূষণজনিত শ্বাসরোগের জন্য পৃথিবীতে বৎসরে ছয়লক্ষ শিশুর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

একদিকে করোনার চোখরাঙানি, তাহার সঙ্গে শীতকালের বায়ুদূষণ, তাই সাবধানতা অবলম্বন করিতেই হইবে। বিগত বৎসরে বিশ্বব্যাপী করোনা প্রাদুর্ভাবকালে ভারত সরকারের সর্বপ্রকার প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর সংযম ও সতর্কতা বিশ্ববাসী লক্ষ্য করিয়াছে। বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধান-সহ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছে। ভারতবাসীর জীবনচর্যা পাশ্চাত্যের অনুরূপ নহে। ভারতবাসী সংযমপূর্ণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তাই শুধু একটু সতর্কতা অবলম্বন করিলেই করোনার সঙ্গে শীতকালীন ব্যাধিগুলিকেও দেশবাসী প্রতিহত জানাইতে সক্ষম হইবে।

সুভাষিতম্

ব্যায়ামাৎ লভতে স্বাস্থ্যং দীর্ঘায়ুষ্যং বলং সুখং।
আরোগ্যং পরমং ভাগং স্বাস্থ্যং সর্বার্থসাধনম্।।

ব্যায়ামের দ্বারা স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুখ লাভ করা যায়। নীরোগ থাকা পরম ভাগ্য আর স্বাস্থ্যের দ্বারাই সর্বকার্য সিদ্ধ হয়ে থাকে।

‘মমতা’ কিন্তু ‘মেসি’ নন তাই শেষ রক্ষা অসম্ভব

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

কিংবদন্তী ফুটবলার লিওনেল মেসির ম্যাজিক ফুটবলে আর্জেন্টিনা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। সে দক্ষতার ম্যাজিক সারা বিশ্ব সাদরে মেনে নিয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগ থেকে তাঁর দল আর নেতাদের বাঁচাতে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেইরকম একটা ম্যাজিক দেখাবেন বলেই দলীয় ভক্তদের ধারণা। তবে আমার মনে হয় সে গুড়ে বালি।

রাজনৈতিক চাটুকারিতার ফলে তৃণমূলের সমর্থকদের বোধবুদ্ধি লোপ পেয়েছে। ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ নিস্তব্ধতা। বিজেপির বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী ইঙ্গিত করেছিলেন মমতা আর তার পরিবারের ডিসেম্বরে শাস্তি হতে পারে। এখন জানুয়ারিতে কিছু হবে বলে অনেকে ছিপ ফেলে বসে আছেন। রাজ্যের জনগণ এটা দেখতে চান অন্যায়কারী আর দুর্নীতিবাজেরা শাস্তি পাচ্ছেন।

মাছ পচে গেলে মুড়োটা আগে পচে। বিরোধীদের ধারণা মমতা আর তার ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মুড়ো। কেটে ফেললে পচা মাছের সদগতি হবে। ঘরের কোণে বা রাস্তার চায়ের আড্ডায় এসব ভাবতে বা আলোচনা করতে ভালো লাগে। বাস্তবায়ন সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। যাঁরা তদন্ত করছেন একবারে নির্ভুল না হয়ে তারা কোনোভাবেই সে কাজে এগোবেন না। অন্যায় ধরতে পারলে যেমন কৃতিত্ব আছে তাড়াহুড়ো করে ভুল করলে লজ্জাও আছে। তাই খুব সতর্কভাবেই এগোচ্ছে তারা। যাতে ‘মিস’ না হয়ে যায়।

আমি যতটুকু জানি মমতা, তার দল,

> প্রশান্ত কিশোর অনেক আগেই জানিয়েছেন বিজেপি থাকতে এসেছে। যেতে নয়। তাই নির্বাচন হেরে গেলেও বিজেপি রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে না। কিশোর যা বলেনি— ‘মমতার শেষ না দেখে বিজেপি যাবে না’।

প্রশাসন আর পরিবারের দুর্নীতি ঘিরে যেভাবে তদন্তের জাঁতাকল তাদের উপর চেপে বসছে তার থেকে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। একমাত্র ম্যাজিকেই তা হতে পারে। মেসির ম্যাজিক তাঁর দক্ষতা। আর মমতার? কেবল দুর্বলতা আর প্রভাবশালীর কাছে করজোড়ে আর্তি। যা এক্ষেত্রে কাজ করবে বলে মনে হয় না।

মহানায়ক উত্তমকুমারের লিপে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ‘মায়ামৃগ’ চলচ্চিত্রের গান ‘পালাবার পথ নাই। নাই রে... কেন? ও তোর যম আছে পিছে’। মমতার পিছনে সে যম। ইডি হোক বা সিবিআই। আমার মতে সেটা তাঁর কুকর্মের ফল। মৃত্যুর পরেও সংস্কার মানুষকে ছাড়ে না। মমতার দলের দুর্নীতি এতটাই গভীরে যে দায়িত্বশীল নেত্রী হিসেবে তিনি রেহাই পেতেই পারেন না যদি না তদন্তে তিনি বা তাঁর দল আর পরিবার নির্দোষ প্রমাণিত হন।

যথারীতি বামপন্থীরা আগেভাগেই হাত তুলে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। তারা ‘দিদি-মোদী’র কল্পিত সেটিং নীতিতে মশগুল। তাদের ধারণা কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি কোনোভাবেই মমতাকে বেকায়দায় ফেলবে না। তাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বামেরাই রাজ্যের মানুষের ভরসা।

এটা তাদের ‘অন্ধ আর খঞ্জ’ বিশ্বাস। কল্পনাও বটে। অন্ধ অন্ধকে পথ দেখালে দু’জনেই খন্দে পড়ে। রাজ্যের মানুষ আর সে ভুল করবেন না। এদেশের বামেদের মস্তিষ্কে অক্সিজেন কম যায়। ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচনের পর থেকে আজ অবধি তারা কখনও দেশের ১০ শতাংশ মানুষের ভোট পাননি। ফিনিক্স পাখি হয়ে না মরে বেঁচে থেকেছেন। এখন বিজেপি ১৮ রাজ্য শাসন করে। আর বামেরা কেবল এক— কেরল। এই মুহূর্তে বিজেপির প্রধান কাজ একটি যথার্থ মমতা বিরোধী মুখ খুঁজে পাওয়া যে কিনা শুভেন্দুবাবুর লড়াইকে আরও শক্তিশালী করবে। মমতার ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর অনেক আগেই জানিয়েছেন বিজেপি থাকতে এসেছে। যেতে নয়। তাই নির্বাচন হেরে গেলেও বিজেপি রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে না। কিশোর যা বলেনি— ‘মমতার শেষ না দেখে বিজেপি যাবে না’। □

মাত্র তো পাঁচশো কোটি টাকা! ফিরিয়ে দাও না দিদি?

বঙ্গদরদিষু দিদি,

নতুন বছরের প্রণাম নেবেন। খুব ভালো হয়েছিল দিদি পার্ক স্ট্রিটের আলো। আপনি আসার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের রংটাই বদলে গিয়েছে। সর্বধর্ম সমন্বয়ের এত আলো আগে দেখা যায়নি কোনও কালেই। সত্যি দিদি এর ফলে রাজ্যের সব আঁধার মুছে ফেলার যে চেষ্টা আপনি করছেন সেটা সম্ভব হবে কি না আমি জানি না। আমি শুধু এটুকুই জানি যে, আমার দিদি আলোর দিদি। আঁধারের নন।

সুতরাং, যে যা বলে বলুক আমি বলি জয় দিদির জয়। চাকরি বিক্রি হয়েছে বেশ হয়েছে। কাজ নেই তো ঠিক আছে। এত কাজ, কাজ করার কী আছে? বাঙ্গালি কবিতা লিখবে, সিনেমা দেখবে, অমিতাভ-শাহরুখ করবে— হয়ে গেল।

তবে দিদি কাগজে যা সব পড়ছি তা কি ঠিক? তা হলে তো আপনার জবাব নেই দিদি। ক্ষমতায় আসার পরে এক বছরের মধ্যেই নাকি আপনি এমন একটা কিছু করার কথা নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলেন যাতে ভাই, ভাইপোদের চাকরির অভাব না হয়। পরীক্ষায় পাশ না করেই মাস্টার হওয়ার রাস্তা আপনি তৈরি করে দিয়েছিলেন। কী খবর পড়লাম সেটা আগে বলে নিই।

পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের সূত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষমতায় অভিষেক ২০১১ সালে আর ঠিক তার পরের বছরেই কলেজ স্ট্রিটে শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত একটি সংগঠনের সূত্রপাত। এবং সেই ২০১২ থেকেই শিক্ষায় বেআইনি নিয়োগ ও অবৈধ লেন-দেনের সূচনা বলে ইডি বা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সূত্রের দাবি। অর্থাৎ তৃণমূল ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে ওই দুষ্টচক্র সক্রিয় হয়ে উঠতে এক বছরের বেশি সময় নেয়নি। তার থেকেও চমকে দেওয়ার মতো খবর, সেই ২০১২ থেকে ২০২২ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষায় দুর্নীতির অঙ্ক সব মিলিয়ে ৫০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে করছে ইডি।

দিদি, কাগজে যা বেরিয়েছে হুবহু টুকে দিলাম। একটুও বদলাইনি। দিদি, আপনি জোর গলায় বলে দিন না, এগুলো মিথ্যে কথা। দোহাই দিদি, নববর্ষের দোহাই, এই নতুন বছরে আপনি বলে দিন যা লিখছে, যা বলছে সব চক্রান্ত। বলে দিন না। তা হলে আপনার এই ভাইটা আপনার সততা নিয়ে আরও গর্ব করতে পারবে। বুক ফুলিয়ে বলতে পারবে আমার দিদি, সেরা দিদি।

কাগজে আরও লিখেছে, শিক্ষা-দুর্নীতির বিভিন্ন পর্যায়ের কথা জানিয়ে ইডির তদন্তকারীদের দাবি, প্রাথমিক পর্যায়ে ২০১৮ থেকে ২০২২ পর্যন্ত বিভিন্ন বেসরকারি ডিএলএড কলেজের ছাড়পত্র, অনুমোদন, পুনর্নবীকরণ এবং অনলাইন ও অফলাইনে পড়ুয়া ভর্তির মাধ্যমে প্রায় ৩০ কোটি টাকার দুর্নীতি ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে। তার পিছনে নাম উঠে এসেছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অপসারিত সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বেসরকারি কলেজ সংগঠনের নেতা তাপস মণ্ডলের। সর্বোপরি রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও পূর্বতন শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় তো আছেনই।

> আপনার এই ভাইটা আপনার সততা নিয়ে আরও গর্ব করতে পারবে। বুক ফুলিয়ে বলতে পারবে আমার দিদি, সেরা দিদি।

ইডির দাবি, এবার ২০১২ থেকে ২০১৭-র মধ্যবর্তী সময়ের দুর্নীতির নথি ঘাঁটতে শুরু করেছে তারা। ওই সময়ে ছয় থেকে দশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বেআইনি নিয়োগ হয়ে থাকতে পারে বলে তদন্তকারীদের সন্দেহ। সেই সব মিলিয়ে ২০১২ থেকে ২০২২ পর্যন্ত অর্থাৎ কম-বেশি ২১ বছরে প্রাথমিকে টাকার অঙ্কে দুর্নীতির পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকার বেশি হতে পারে বলে সন্দেহ করছেন তদন্তকারীরা।

খবরের কাগজ অনুযায়ী, তদন্তকারীদের দাবি, এর মধ্যে ২০১৪ এবং ২০১৭-য় মূলত তাপস ও বীরভূমের ওই দাপুটে নেতার মাধ্যমে টাকার বিনিময়ে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল বলে তদন্তে জানা গিয়েছে। ইডি সূত্রের দাবি, তখনও ওই সব বেআইনি নিয়োগ চলত সাদা খাতা মারফত। তার পাশাপাশি ২০১৪ এবং ২০১৭-র প্রাথমিক টেটে উত্তীর্ণ এবং বেআইনি নিয়োগের জন্য প্রার্থী-পিছু মোটা টাকা নেওয়া হয়েছিল বলেও ইডির প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে।

যদি সত্যি হয় দিদি, তবে আপনি ওই ৫০০ কোটি টাকা ফিরিয়ে দিন। ল্যাটা চুকে যাবে। সরকারের টাকা নেই আমি জানি। তা হলে তো অনেক কিছুই হয়ে যেত। দরকার নেই দিদি, অভিষেক দাদা, অনুব্রত কাকুদের বলুন না। ওঁরা ঠিক দিয়ে দেবেন। তার পরে ফেরতটা কিন্তু আপনি দেবেন।

তবেই না আমি গর্ব করে বলতে পারব, আমার দিদি, সততার দিদি। □

বিলাওয়াল ভুট্টো তার নিকৃষ্ট মানসিকতারই পরিচয় প্রকাশ করেছেন

মণীন্দ্রনাথ সাহা

যে কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রী অন্য দেশের মন্ত্রীদের কাছ থেকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন আশা করতেই পারেন। কিন্তু পাকিস্তানের কাছ থেকে এমনটা আশা করা বোধহয় বাতুলতা মাত্র। তা না হলে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টোর মুখে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে 'গুজরাটের কসাই' মন্তব্য শোনা যেত না। বিলওয়ালের ভাষা প্রয়োগ সভ্যতা ও শালীনতার সমস্ত সীমা অতিক্রম করেছে। তবে শুধু ভারত নয়, আন্তর্জাতিক সমাজের পক্ষেও এধরনের বিষাক্ত ভাষা ওগলানো এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ গ্রহণযোগ্য নয়। সঙ্গত কারণেই ভারতের বিদেশমন্ত্রক পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রীর এই আচরণকে 'অসভ্যতা' বলে অভিহিত করেছেন। দেশজুড়ে তার প্রতিবাদও হয়েছে।

জেহাদি রাজনীতির ধারকবাহক পাকিস্তান নামক দেশটি জন্মলগ্ন থেকেই এই উপমহাদেশের মানুষকে অশান্তির আগুনে দগ্ধ করে মারছে। কেবল জন্মলগ্ন থেকেই নয়, ১৯৩০ সালে, যেদিন থেকে পাকিস্তানি ভাইরাস মুসলমানের মানসিকতাকে গ্রাস করেছে, সেদিন থেকে এতদঞ্চলের রাজনৈতিক পরিবেশে দূষণ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সৌহার্দ্য চিরতরে বিলীন হয়ে গেছে। যার পরিণতিতে অজস্র নির্দোষ নর-নারীর রক্তপাতের মাঝে জন্ম নিয়েছে পাকিস্তান নামক দেশটি। নেতিবাচক ভাবনায় যার জন্ম তার কার্যকলাপে, বচনে-আচরণে শুভ চেতনা, সুন্দরের ভাবনা, সুপ্রীতির প্রকাশ আশা করাই বৃথা। তবু সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা আশা করেছিলেন, কালে কালে বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই দেশের জীবন দর্শনের পরিবর্তন ঘটবে, বালসুলভ চাপল্যভাব কেটে যাবে। কিন্তু আশাবাদীদের এই অলীক আশা অচিরেই বিলীন হয়ে গেছে। স্বাভাবিক নিয়মে যার জন্ম হয়নি, তার কাছে সভ্যতা, শালীনতা আশা করাই বৃথা। জাতশত্রু পাকিস্তানও তার জন্মকালীন চরিত্র ভুলতে পারেনি।

পাকিস্তান তাদের নিজেদের অদূরদর্শিতা ও দুর্বুদ্ধির ফলে একবার তার দু' অংশে অঙ্গহানি

ঘটেছে। পশ্চিমাংশ থেকে পূর্বাংশ আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তখন কেউ কেউ ভেবে থাকতে পারে যে ক্ষুদ্রাবয়ব পাকিস্তানের হয়তো শুভবুদ্ধির উদয় হবে। প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিতে বসবাস করতে শিখবে। কিন্তু হা-হতোস্মি! কথায় বলে স্বভাব যায় না ম'লে, ময়লা যায় না কয়লা ধুলে। পাকিস্তানের সেই দশা।

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর কন্যা বেনজির ভুট্টোর পুত্র এই বিলাওয়াল ভুট্টো। তিনি পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী। বিলাওয়ালের মা বেনজির ভুট্টোর মৃত্যু হয়েছিল তাদেরই পালিত সন্ত্রাসীর হাতে। জুলফিকার যেমন নির্লজ্জের মতো আমৃত্যু ভারত বিরোধিতা এবং ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছর যুদ্ধ করার কথা বলেছেন, তাঁর নাতি বিলাওয়ালও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে কুৎসিত আক্রমণ করলেন।

সন্ত্রাসের মদতদাতা পাকিস্তানের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে তার পূর্বাংশ আলাদা দেশ বাংলাদেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ১৯৭২ সালে। সেই সময় ভারতের অত্যন্ত ক্ষুরধার মস্তিষ্কের অধিকারিণী এবং অসম সাহসিনী ইন্দিরা গান্ধীর এক থাপ্পড়ে জুলফিকার বাঘ থেকে ইঁদুরে পরিণত হয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর বহু বছর পর আর একজন অত্যন্ত শক্তিশালী নেতা বর্তমানে ভারতের শাসন ক্ষমতায় রয়েছেন। তিনি নরেন্দ্র মোদী। তাঁর ভয়ে পাকিস্তান ভীত সন্ত্রস্ত।

পাকিস্তান ভারত বিরোধিতার নামে যতবার যুদ্ধে জড়িয়েছে ততবারই ভারতের হাতে পরাজিত হয়েছে। তবুও তাদের লজ্জা হয়নি। পূর্বপাকিস্তান হাতছাড়া হয়েছে। অধিকৃত কাশ্মীরে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। তারা প্রকাশ্যেই বলছে, 'আমরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই।' অধিকৃত কাশ্মীরের মতো বালুচিস্তানেও বিদ্রোহের গনগনে আগুন জ্বলছে। তারাও ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বালুচিস্তানের স্বাধীনতায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছে।

কাণ্ডজ্ঞানহীন পাকিস্তানি নেতারা তিনবার ভারতের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে তার যে প্রত্যাঘাত পেয়েছিল তার পরেও তাদের লাজলজ্জা বলে কিছু নেই। সবাই জানে পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর। পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি পারভেজ মুশারফ স্বীকার করেছিলেন, পাকিস্তানের মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলিতে সন্ত্রাসবাদের চাষ হয়। আন্তর্জাতিক মহলের তা অজানা নয় যে সন্ত্রাসবাদ পাকিস্তানের সরকারি নীতির একটি অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারত ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে অসত্য ও অশালীন অভিযোগ এনে বিলাওয়াল ভুট্টো তাঁর রক্তের ধারার প্রমাণ রাখতে পারেন, কিন্তু তা বিশ্ব সমাজে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হবে না। □

যিশু সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটিত হওয়া প্রয়োজন

বরুণ মণ্ডল

বিশিষ্ট জার্মান দার্শনিক ফেরার কায়সার তাঁর 'জেসাস ডায়েড ইন কাশ্মীর' গ্রন্থে লিখেছেন, যিশু ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর তার দেহের ক্ষতগুলি শুকিয়ে গেলে তিনি তার মা মেরিকে নিয়ে ভারতের কাশ্মীরে চলে আসেন। যিশুর সঙ্গে তাঁর শিষ্য টমাসও ছিলেন। কাশ্মীরে নাকি তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং পরিণত বয়সে তার মৃত্যু হয়। কাশ্মীরের শ্রীনগরের কাছে রোজাবেল গির্জার নীচে সমাধিগৃহে তাঁকে কবর দেওয়া হয়।

সুলেখক ও পরিব্রাজক আর কে দাস তার বিশিষ্ট গ্রন্থ 'লেজেন্ডস অব জগন্নাথপুরী'তে লিখেছেন, যিশুখ্রিস্ট পুরীতে এসেছিলেন। পুরী থেকেই তিনি তিব্বতের রাজধানী লাসায় চলে যান। যিশু যে অজ্ঞাতবাসের সময় ভারতে এসেছিলেন তার আরেকটি অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন সিরিয়াক বাইবেলে। এছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকায় থাকাকালীন একটি পুস্তক পড়ে যিশুর কাশ্মীরে আসার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

আমেরিকায় থাকাকালীন স্বামী অভেদানন্দ ড. নিকোলাস নটোবিচের বিখ্যাত বই 'দি আননোন লাইফ অফ জেসাস ক্রাইস্ট' পাঠ করেন। নিকোলাস নটোবিচ একটি প্রাচীন দুর্লভ পুঁথি ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে মধ্যতিব্বতের হিমিশ গুহার মধ্যে দেখতে পান। নটোবিচ বিখ্যাত হিমিশ গুহা তথা হিমিশ মঠে রক্ষিত যিশুর সমসাময়িককালে ভারতের প্রাচীন পালি ভাষায় রচিত এই অবিস্মরণীয় পুঁথি থেকেই যিশু তথা ইশার জীবন সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করেছিলেন। যেখানে যিশুর ১৩ থেকে ২৯ বছর পর্যন্ত দিব্য জীবনের কথা পালি ভাষায় লিখিত রয়েছে। এই দীর্ঘ ১৭ বছর তিনি ভারতে অতিবাহিত করেন পরিব্রাজক হিসেবে এবং বিভিন্ন পাহাড়-পর্বতে গিয়ে যোগ সাধনায় নিমগ্ন থাকেন। পরবর্তীকালে স্বামী অভেদানন্দ ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে তিব্বতের হিমিশ মঠে এসে সেই পুঁথি পাঠ করেন এবং অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন।

বিচারবুদ্ধি দিয়ে ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে পুরীর গোবর্ধনপীঠের শঙ্করাচার্যের কথার সত্যতা মিলতে পারে। কারণ যিশুখ্রিস্ট একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। দু' হাজার বছর আগে আবির্ভাব। কিন্তু মানুষের উৎপত্তি তো তারও আগে। তবে তার আগে মানুষ কি ধর্মহীন ছিল?

হিন্দু শাস্ত্রমতে পরমব্রহ্মাবতার শ্রীরামচন্দ্রকেও গুরু গ্রহণ করতে হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও গুরু গ্রহণ করতে হয়েছিল। আর অসুরদের গুরু ছিলেন শুক্রাচার্য। বলা হয় শুক্রাচার্যের পথ ও মতকে অবলম্বন করেই ইসলাম তৈরি। জনশ্রুতি যে, পবিত্র কাবা ঘরে শুক্রাচার্যের পরমারাধ্য শিবের মূর্তি রয়েছে। যদিও এটি চরম বিতর্কিত মতামত। কথায় বলে, 'যা রটে তা কিছুটা হলেও ঘটে'। সুতরাং যিশুখ্রিস্ট বা মোহম্মদ যে সনাতন ধর্মের ব্যক্তি ছিলেন তা বিতর্কিত হলেও অসম্ভব কিছু নয়।

হিন্দুদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবত গীতা এবং ভাগবতমে হিন্দুধর্ম বলে উল্লেখ করা নেই। সুতরাং খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারক যিশুখ্রিস্ট বা ইসলামের প্রচারক মোহাম্মদ হিন্দুধর্মের ছিলেন বলতে বর্তমানে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের কথা বলা হচ্ছে না। ওই দুই ধর্মগ্রন্থ অনুসারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবমাত্রেই সনাতন ধর্মের অনুসারী। সেই সনাতন ধর্মের কথাই গীতা ও ভাগবতমে বলা হয়েছে।

শুধু খ্রিস্ট, ইসলাম, জৈনমত, বৌদ্ধমত ইত্যাদি গ্রহণ করে ওই ধর্মের অনুসারী হতে হয়। তার জন্য তাদের নিজস্ব রীতিনীতি রয়েছে। কিন্তু জীবমাত্রেই সনাতন ধর্মের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এ সকল যুক্তি বিতর্কিত মনে হলেও সনাতন শাস্ত্রসমূহ মূলত 'শ্রীমদ্ভগবতগীতা এবং 'ভাগবতম্' গ্রন্থ দুটি হৃদয়ঙ্গম করলে সমস্ত বিতর্কের অবসান হয়। ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীকৃষ্ণকৃপাশ্রী শ্রীঅভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই দুই গ্রন্থের ইউরোপীয় ভাষায় ভাষ্য রচনা করে ইউরোপীয়দের নাস্তিকতা এবং ধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্তি দূর করে সনাতন ধর্মে পুনরাগমন ঘটিয়েছেন এবং তাঁর রচিত গ্রন্থ হৃদয়ঙ্গম করে লক্ষ লক্ষ মানুষ সনাতন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন।

তর্ক বিজ্ঞান শিক্ষা শাস্ত্রের এক উন্নততর শাখা। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব নিজেই বিখ্যাত তার্কিক ছিলেন। তাই পুরীর শংকরাচার্যের 'যিশুখ্রিস্ট হিন্দু ছিলেন'— এই বিতর্কিত মন্তব্যকে হাতিয়ার করেই প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন হবে এই আশা রাখা যেতেই পারে।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

চীনের কোভিড-তথ্য গোপন

আগামী পৃথিবীর জন্য ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনবে

এই প্রতিবেদন যখন লেখা হচ্ছে, তখন আমাদের দেশে কোভিড পরিস্থিতি বেশ সন্তোষজনক। কেন্দ্রের স্বাস্থ্য বুলেটিন অনুযায়ী, এদেশে সংক্রমক রোগী দৈনিক প্রায় সাড়ে তিনি হাজারেরও কম, বিগত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৯৪ জন, সুস্থ হয়েছেন ১৯০ জন, কারোর মৃত্যু হয়নি।

অর্থাৎ ভারতে কোভিড পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে আছে। উদ্‌বেগেরও কারণ নেই। তবুও ভারতবাসী উদ্‌বিগ্ন হচ্ছেন, শুধু ভারতবাসীই কেন, বকলমে গোটা বিশ্ববাসীই উদ্‌বিগ্ন, আবার একটি ভয়ের পরিস্থিতি। কোভিড আবার ফেরত এলো বলে। অর্থাৎ আবার লকডাউন, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হওয়া, আরও বহু মানুষের দারিদ্র্যসীমার নীচে চলে যাওয়া ইত্যাদি। আচমকা এই পরিস্থিতির উদ্ভব হলো কেন? কারণ এই ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টির নেপথ্যে রয়েছে চীন।

চীনে কোভিড পরিস্থিতি আরও একবার ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। হাসপাতালে কোভিড রোগী উপচে পড়ছে, রোগীর পরিজনদের হাহাকার, মৃত্যু মিছিল। অর্থাৎ আমাদের দেশে ২০২১ সালে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, চীনের বর্তমান পরিস্থিতি প্রায় একইরকম।

ভাইরোলজিস্টরা বলছেন, কোভিড ভাইরাসের চরিত্র তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য। ফলে সংক্রমণ কখন, কীভাবে মারাত্মক আকার নেবে তা আগে থেকে বোঝা বা অনুমান করা দুঃসাধ্য। সুতরাং কোনো দেশে যে কোনো সময় কোভিডের পরিস্থিতি শোচনীয় হতে পারে। এতে নতুনত্ব কিছু নেই। বাকি দেশগুলির ভয়ের কারণও নেই। তবুও চীনের এই কোভিড পরিস্থিতিতে সারা বিশ্ববাসী উদ্‌বিগ্ন তো বটেই, তার অন্যতম অবশ্যই মানবিক কারণে, তবে উদ্‌বেগ ছাপিয়ে গভীর আতঙ্কে রয়েছে বিশ্ববাসী।

কেন? কারণ যে দেশটিতে সংক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, তার নাম চীন। যেখানে প্রকৃত তথ্য কখনো সামনে আনা হয় না, অন্তত সরকারি উদ্যোগে। হাসপাতালে রোগী উপচে পড়ছে, অক্সিজেনের চাহিদা আকাশছোঁয়া, অক্সিজেনের অভাবে মানুষ মারা যাচ্ছেন, অথচ এই পরিস্থিতিতে চীন সরকারিভাবে দাবি করে এসেছে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে, প্রতিদিন বেশি নয়, প্রায় হাজার তিনেকের মতো সংক্রমণ হচ্ছে।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি তাদের দাবি ছিল দীর্ঘ এক সপ্তাহে কোভিডে তাদের দেশে মৃত্যু হয়নি। যদিও সোশ্যাল মিডিয়ায় চীনের ভয়াবহ কোভিড পরিস্থিতির ছবি ধরা পড়ছিলই। এদিকে এক মার্কিন সংবাদমাধ্যমে চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের প্রতিবেদন ফাঁস হয়ে গিয়েছে। যাতে বলা হয়েছে, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সপ্তাহে চীনে একদিনের সংক্রমণই চোখ কপালে তুলে দেওয়ার মতো। ফাঁস হওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় পৌনে চার কোটি চীনা নাগরিক কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে। রিপোর্টে আরও জানা যাচ্ছে, ডিসেম্বরের প্রথম কুড়ি দিনে সেদেশে প্রায় পঁচিশ কোটি মানুষ সংক্রমিত হয়েছেন। অর্থাৎ চীনের প্রায় আঠারো শতাংশ নাগরিকই এখন কোভিডে আক্রান্ত। যদিও রিপোর্টে কোভিডে মৃতের সংখ্যা কত তা বলা নেই। কিন্তু যে হারে গুরুতর আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে মৃতের সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে তা ভেবেই শঙ্কিত হচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

কোভিড দমনে চীন কোনোদিনই আন্তরিক ছিল না, আর এখন তাদের তথ্যগোপনের চিরকালীন নীতি এই কোভিড সংকটকে আরও ঘনীভূত করবে।

এদিকে ভারতের আতঙ্ক অন্য জায়গায়। চীন ফেরত সংক্রামিত ব্যক্তিরা ধরা পড়ছেন ভারতীয় বিমানবন্দরে। ফলে চীনের থেকে আবার এদেশে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা থাকবেই। তার জন্য ভারত সরকারও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। যেমন জোর দেওয়া হয়েছে বুস্টার ডোজ কোভিড টিকাকরণে। গত ১৭ ডিসেম্বর করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সারা দেশজুড়ে সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে 'মক ড্রিল' ও চালানো হয়েছে। কিন্তু সমস্যা অন্যত্র। বিশেষজ্ঞরা এই ভাইরাসের গতিপ্রকৃতি দেখে মনে করছেন, কোভিড নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় একে কড়া পর্যবেক্ষণে রেখে এর গতিপ্রকৃতির ওপর নজর রাখা। ঠিক এই জায়গাতেই প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দিচ্ছে চীন। তারা যে মারাত্মকভাবে তথ্য গোপন করছে, কোভিড পর্যবেক্ষণ করা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে উঠছে।

ফলে ভারতের মতো নিয়ন্ত্রিত দেশেও কোভিড ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। এটা প্রমাণিত সত্য যে, কোভিড দমনে চীন একেবারেই আন্তরিক নয়। একথা মনে রাখতে হবে যে, বায়োলজিক্যাল যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে এই মারণ ভাইরাসের জনকরূপে চীনের খ্যাতি ছড়িয়েছিল আগেই। চরম কোভিড পরিস্থিতিতেও ভারতের গালওয়ান প্রদেশে তাদের লালফৌজ ঢুকিয়ে এলাকা দখল করে তাদের আধিপত্যবাদী নীতি থেকে একচুলও সরেনি চীন। সুতরাং কোভিড দমনে চীন কোনোদিনই আন্তরিক ছিল না, আর এখন তাদের তথ্যগোপনের চিরকালীন নীতি এই কোভিড সংকটকে আরও ঘনীভূত করবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। চীনের এই প্রবণতা দক্ষিণ এশিয়া তো বটেই, অচিরেই গোটা পৃথিবীতে দুর্যোগ ঘনিয়ে আনবে। মানবতার শত্রুদের এখনই চিহ্নিত করতে না পারলে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে অদূর ভবিষ্যতে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে, এমনটাই অভিমত বিশেষজ্ঞদের।

তসলিমার ‘লজ্জা’ এবং আজকের বাংলাদেশ

কৌশিক কর্মকার

দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজোর পর প্রথম রবিবারের সকাল। বাতাসে হালকা শীতের রেশ অনুভূত হচ্ছে। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ একটি খবরে চোখ আটকে গেল। যদিও ছোটো আকারে ভিতরের পাতায় প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে তবুও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংসদের নিম্নকক্ষের (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস) দুই সদস্য স্টিভ চ্যাবট এবং রো খন্না একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন যেখানে তাঁরা বলেছেন ১৯৭১ সালে পাকসেনা চালিত গণহত্যার জন্য পাকিস্তানকে অবিলম্বে ক্ষমা চাইতে হবে। স্টিভ চ্যাবট তাঁর কৃত টুইটে বলেন, একাত্তরের গণহত্যা সুনির্দিষ্টভাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে চালিত হয়েছিল। তাঁর কৃত টুইটটি উদ্ধৃতি যোগ্য :

‘The Bangladesh Genocide of 1971 must not be forgotten. With help from my Hindu constituents in Ohio's First District, @RepRoKhanna and I introduced legislation to recognize that the mass atrocities committed against Bengalis And Hindus, in particular, were indeed a genocide.'

স্টিভ বলেছেন এই গণহত্যা কোনোভাবেই বিস্মৃত হওয়ার নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগুরু হিন্দু জনগণ, পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্‌বাসিত লক্ষ লক্ষ উদ্‌বাস্তুর উত্তর পুরুষেরা কতজন মনে রেখেছে পাকসেনার এই নৃশংসতার ইতিহাস? উত্তর কিন্তু লজ্জাজনকভাবে নেতিবাচক। ১৯৭১ সালের ২০ মে খুলনার চুকনগরে ভদ্রা নদীর তীরে পাকসেনা একসঙ্গে প্রায় ১০ হাজার সংখ্যালঘু হিন্দুকে হত্যা করে। সংখ্যাটা কম-বেশি ১০০০০! চুকনগর কোথায়? গুগল ম্যাপ বলছে বসিরহাটের ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত থেকে চুকনগরের দূরত্ব মাত্র ৪৩ কিলোমিটার। হ্যাঁ, এখানেই ঘটেছিল উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ গণহত্যা। প্রায় দু'হাজার কিলোমিটার দূরে সংঘটিত জালিয়ানওয়ালাবাগের নিহতের সংখ্যা ছিল ৩৭৯ থেকে ১৫০০-এর মাঝামাঝি। পূর্ববঙ্গের উদ্‌বাসিত হিন্দুসমাজ যারা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় পেয়েছিল তারা বা তাদের উত্তর প্রজন্ম চুকনগরকে মনে রাখেনি। বাংলাদেশ তাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে অতি সচেতন; তাদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পৃথক মন্ত্রণালয়ও রয়েছে। তারা চুকনগরে স্মারক নির্মাণ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের খ্যাতনামা অধ্যাপক মুনতাসির মামুনের নেতৃত্বে তাঁর সুযোগ্য গবেষকদল সাক্ষাৎকার নিয়েছে সেই নারকীয় ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের; তা লিপিবদ্ধ করেছে; পুস্তক আকারে প্রকাশ করেছে। তাঁরা চেয়েছেন জনমানসে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সদাজাগ্রত থাকুক। তাঁরা এ বিষয়ে যত্নশীল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উদ্‌বাস্তু সমাজ? ইতিহাস বিস্মৃতি, আত্মবিস্মৃতির এক অনন্য নজির স্থাপন করেছি আমরা।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়লে দেখা যায় পাক আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল সংখ্যালঘু হিন্দু ও আওয়ামি লিগের রাজনৈতিক কর্মীরা।

When asked of apolitical Muslim citizens as to how they survived the terrible days of Bangladeshi Liberation War, from March 1971 through December of 1971, almost everyone says that 'life was difficult, but we were not physically targeted as the political violence was directed exclusively towards Hindu and some Awami Leaguers' (party activists).

আওয়ামি লিগ পাকিস্তান সরকারের রাজনৈতিক বিরোধী গোষ্ঠী; তারা সরকারকে উৎখাত করতে চায়। তাদের বিরুদ্ধে পাক সেনার অসূয়া থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রান্তিক এলাকার সাধারণ সংখ্যালঘু হিন্দু গ্রামবাসী? যাদের ন্যূনতম কোনো রাজনৈতিক চেতনা নেই, যারা কখনো কোনো রাজনৈতিক সমাবেশে অংশ নেয়নি, সেই অসহায় সরলপ্রাণ নিম্নবিত্ত সংখ্যালঘু হিন্দুদের বিরুদ্ধে গণহত্যা সংঘটিত হলো কেন? আর পাকসেনার এই বীভৎস কর্মকাণ্ডে সহায়ক ছিল রাজাকার-আলবদর-আলশামস ইত্যাদি গোষ্ঠীভুক্ত বাংলাভাষী মুসলমানরা। বলাবাহুল্য, যাদের প্রত্যেকের মাতৃভাষা ছিল বাংলা; তারা ওই বাঙ্গালি নিধনের এই কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। সেদিন এই পুরোদস্তুর সাম্প্রদায়িক আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে হিন্দু শূন্য করে তাদের সম্পদ সম্পত্তি লুট ও দখল করা। সংখ্যাগুরুর জেহাদিবাদী এই অংশ বাংলাদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়; তাদের প্রভূত জনভিত্তিও রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষকে হত্যার পরেও এই জেহাদি গোষ্ঠী বাংলাদেশের সরকারে আসীন হয়েছে যা থেকে জনমানসের স্বরূপ সম্পর্কে অনেকখানি ধারণা পাওয়া যায়। এ কারণেই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া; প্রায় দৈনন্দিন ভিত্তিতেই তা ঘটে থাকে; যার নগ্ন প্রকাশ ঘটে যায় সাম্প্রতিককালে ২০২১ সালের অক্টোবরে সারা দেশজুড়ে সংঘটিত দুর্গামণ্ডপ, প্রতিমা, সংখ্যালঘুর স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের উপর নির্বিশেষ আক্রমণে। সংখ্যালঘুরা সেখানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক যারা প্রতি মুহূর্তে নিরাপত্তাবোধের অভাবে ভয়ে কুঁকড়ে থাকে।

যারা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নিধনের এই ইতিবৃত্ত সারা বিশ্বের সামনে উন্মোচন করেছেন, তাঁদের পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ। যাদের মধ্যে অন্যতম লেখিকা তসলিমা নাসরিন। যার ক্ষুরধার কলম বাংলাদেশের জেহাদি স্বরূপকে উলঙ্গ করে দেওয়ায় তাঁকে সারাজীবনের মতো নির্বাসিত হতে হয়েছে। বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের অব্যবহিত পরে রচিত লেখিকার উপন্যাস ‘লজ্জা’ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কারণ বাংলাদেশকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল এই উপন্যাস। প্রকাশের চার দশক পরেও উপন্যাসটির গুরুত্ব এতটুকু হ্রাস পায়নি; আজও তা ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। ২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গে উপন্যাসটির ঊনবিংশতম মুদ্রণ তারই সাক্ষ্য বহন করে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুরঞ্জন

আশৈশব এক চূড়ান্ত উদারবাদী, সংস্কারমুক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশে বেড়ে উঠেছিল; ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে সে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাস রাখে না এবং বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। শোষক-শোষিত, শ্রেণী, শ্রেণীসংগ্রাম ইত্যাদি তত্ত্বে বিশ্বাস রাখে এবং তার প্রচার ও প্রসারে উন্মুখ হয়ে পড়ে। তার একমাত্র পরিচয় হয়ে ওঠে সে 'মানুষ'; মনুষ্যত্বই হয়ে ওঠে তার ধর্ম। তবে কালক্রমে পরিস্থিতি তাকে 'মানুষ' থাকতে দেয় না, ক্রমশ সে হয়ে ওঠে 'হিন্দু'। যে পরিচিতিকে সে চিরকাল দূরে সরিয়ে রেখেছে সেই পরিচিতিই পরিশেষে তার একমাত্র আশ্রয় হয়ে ওঠে। সে তখন আশৈশব তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করে দেখে সে নিজেকে 'মানুষ' মনে করলেও তার বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, সহকর্মী, পার্টির কমরেড-সহ সম্পূর্ণ সমাজের কাছে সে 'হিন্দু' হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে। তথাকথিত উদারবাদী প্রগতিশীল বামপন্থী পার্টিতেও সহকর্মীদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব সে আবিষ্কার করে; যেগুলো হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে সে বুঝতে পারেনি। সে তখন অনুধাবন করে 'হিন্দু হয়ে বাংলাদেশে বেঁচে থাকবার কোনও অর্থ হয় না'; 'ইন্ডিয়া'য় চলে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। আজকের পশ্চিমবঙ্গের সুরঞ্জনরা 'যারা হিন্দু হওয়ার আগে তুমি মানুষ ছিলে' স্লোগান তুলে আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে ফেলছে, তাদের জন্য সুরঞ্জনের এই কাহিনি আবশ্যক বই কী!

সুরঞ্জন সুধাময়ের পুত্র। কে এই সুধাময়? সুরঞ্জনের পিতা ছাড়াও তার বেশ কিছু পরিচয় আছে। সুধাময় পেশায় চিকিৎসক, বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, গর্বিত মুক্তিযোদ্ধাও বটে! বিয়ের পর স্ত্রীর পুজোআচ্চা সংস্কারে আপত্তি তুলেছিলেন। শৈশবে সুরঞ্জন যখন তার সহপাঠী প্রদত্ত গোমাংস খেয়ে রীতিমতো বিপন্ন বোধ করছে, তখন পরদিন সুধাময় বাজার থেকে গোমাংস এনে কিরণময়ীকে দিয়ে রান্না করান; উদ্দেশ্য সংস্কারমুক্তি। ক্রমশ সুরঞ্জনের চোখে সুধাময় হয়ে ওঠেন 'অতিমানব'। একাত্তরে পাকসেনা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে 'মুসলমান' করতে চায়; সুধাময় 'মুসলমান' হতে না চাওয়ায় পাকসেনা তাকে 'মুসলমান' করে দেয়। লেখিকার বয়ানে ঘটনাটি জীবন্ত রূপে ফুটে উঠেছে :

''ওরা কড়িকাঠে ঝুলিয়ে পিটিয়েছিল তাঁকে। পেটাতে পেটাতে বারবারই বলেছিল মুসলমান হতে। কলমা পড়ে মুসলমান হতে। অ্যালেক্স হ্যালির রুটস-এ কালো ছেলে কুন্টা কিন্টেকে যেমন তার নাম টোবি বলবার জন্য যারা চাবুক মারছিল পিঠে, তাদের সে বারবারই বলছিল তার নাম কুন্টা কিন্টে। সুধাময় যখন কিছুতেই মুসলমান হতে চাইলেন না, মুসলমান যখন হবিই না এই নে তোর মুসলমানি করে দিলাম বলে ওরা একদিন লুঙ্গি তুলে খচ করে কেটে ফেলল তাঁর পুরুষাঙ্গ।

যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে যান সুধাময়। সেই একাত্তর থেকে নপুংসকের জীবন কাটাচ্ছেন তিনি। স্ত্রী কিরণময়ীকে তিনি বলতেন 'তুমি যদি ইচ্ছে করো না হয় নতুন করে সংসার করো আমি কিছু মনে করব না।" এই সংস্কারমুক্ত মানুষটি তাঁর পৈতৃক ভিটে ময়মনসিংহ থেকে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন; জলের দরে বাড়ি বিক্রি করে ঢাকায় বাড়ি ভাড়া নেন। তবে এহেন ইসলামিক আধিপত্যবাদও তার সাম্যবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে চিড় ধরাতে পারেনি; কোনো অবস্থাতেই দেশ ছেড়ে যাওয়ার কথা সে কল্পনাও করতে পারে না। চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক আক্রমণকেও যে চিরকাল শাসক-শোষিতের দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখে এসেছে অথবা নিতান্ত আইন-শৃঙ্খলা জনিত সমস্যা হিসেবে নিরূপণ করেছে, যুবতী কন্যা 'মায়া'র অপহরণ ও সংসারের বিপন্নতা সেই যুক্তিবাদী প্রগতিশীল বামপন্থী সুধাময়কেও চূড়ান্তরূপে বিপন্ন করে তোলে। ইন্ডিয়া যাওয়ার প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে তিনি পারেন না, কারণ 'তাঁর ভেতরে গড়ে তোলা শক্ত পাহাড়টিও দিনে দিনে ধসে পড়েছে'। আজকের পশ্চিমবঙ্গ সুধাময়দের সংখ্যা কম নয়, তারা তাদের সংস্কার মুক্তির বিজ্ঞাপনে অতিসচেষ্ট, তাদের জন্য সুধাময়ের কাহিনি অবশ্যস্মর্তব্য।

সুরঞ্জনের বিশ্বাস হয় না তার বন্ধু, সহকর্মী কামাল, বেলাল, কায়সার, লুৎফর এরা কেউ অসম্প্রদায়িক লোক। মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে যে সংবিধান প্রণীত হয়েছিল, তার চারটি আদর্শের মধ্যে একটি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। এরপর আটাত্তরে সংবিধানের মাথায় খোদিত হয় 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম', ১৯৮৮ সালের অষ্টম সংশোধনীতে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। যে ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা, বাঙ্গালি জাতীয়তাবোধের উপর ভিত্তি করে বিরাট মুক্তিযুদ্ধের কার্যক্রম সঞ্চালিত হয়েছিল, সেই মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস রাখা রাজনৈতিক দল ও তার কর্মী-সমর্থকদের ক্ষুব্ধ করেনি সংবধিান সংশোধনের এ জাতীয় কার্যাবলী; তাদের চালিত করেনি প্রতিবাদের পথে। সুরঞ্জনের মনে প্রশ্ন জাগে। সুরঞ্জনের এখন বিশ্বাস হতে চায় না কামাল, বেলাল, কায়সার, লুৎফর এরা কেউ অসাম্প্রদায়িক লোক। আটাত্তরে জনগণ কি সংবিধানে বিসমিল্লাহ বসাবার আন্দোলন করেছিল যে জিয়াউর রহমানের সরকার বিসমিল্লাহ বসাল? অষ্টআশিতে জনগণ কি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করবার জন্য কেঁদেছিল যে এরশাদ সরকার ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করল? কেন করল? সেকুলারিজমে নাকি বাঙ্গালি মুসলমানের অগাধ বিশ্বাস, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির! কই, তাঁরা তো রাষ্ট্র কাঠামোয় সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ বপন করা দেখেও তেমন ক্ষুব্ধ হয়নি? ক্ষুব্ধ হলে কী না হয়! এত বড়ো একটি যুদ্ধ ঘটিয়ে দিতে পারে যে দেশের রক্ত-গরম মানুষ, সে দেশের মানুষ আজ সাপের মতো শীতল কেন?

সে বুঝতে পারে প্রকাশ্যে না হোক নেপথ্যে, সমাজের অন্তঃস্থলে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি বয়ে চলেছে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো। তা চারিত হয়ে যাচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে। সুরঞ্জনের স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে শৈশবের একটি দৃশ্য যেখানে তার সহপাঠী তাকে গাল দিয়েছিল 'হিন্দু' বলে! আজকের বাংলাদেশেও এই প্রবণতার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। মাস দুয়েক আগে একটি ভিডিয়ো ক্লিপিংস ছড়িয়ে পড়েছিল ইউটিউবে। ভিডিয়োতে সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে একজন শিশু জানাচ্ছে, সে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের মাশরাফি, মোস্তাফিজুর, শরিফুল, তাসকিনের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেও সৌম্য সরকারের সঙ্গে দেখা করতে চায় না, কারণ সে হিন্দু! ক্যামেরার সামনে শিশুটির পিতা সামান্য বিব্রত বোধ করলেও এটিই বাস্তব ও সত্য। কোনো ন্যারেটিভ বা কোনো ফোটোগ্রাফ দিয়ে এই আকাঁড়া সত্যকে চাপা দেওয়া যাবে না। এখানে বক্তা শিশু হওয়ার কারণেই সত্যকথন স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে;

অন্যথায় তা হয়তো গোপন থাকত; কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নেপথ্যের সত্যটি থাকত অবিকৃত। সংখ্যাগুরুর এহেন মনোবৃত্তিই বাংলাদেশের রাজনীতিকে পরিচালিত করে এসেছে এবং এখনও করছে, এ কারণেই সংখ্যাগুরু জেহাদির আক্রমণের বিরুদ্ধে, তা বন্ধের বিষয়ে সরকারের তেমন কোনো সদিচ্ছা নেই, সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনার বিচার হয় না। উপন্যাসের ঘটনাকাল অর্থাৎ ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর এবং বর্তমান সময়কাল অর্থাৎ ২০২১-এর অক্টোবর, দুই সময়েই তদানীন্তন বিরোধী নেত্রী এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যে ভোট রাজনীতির এই সমীকরণটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ২০২১ সালের অক্টোবর মাসের ১৩-১৪-১৫ তারিখ জুড়ে সারা দেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের পূজামণ্ডপ, বাসস্থান, সম্পদের ওপর যে নির্বিচার ধ্বংসলীলা চলে তার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বক্তব্য ছিল এরূপ ঃ 'শুধু আমাদের নিজেদের দেশ না, প্রতিবেশী দেশকেও সজাগ থাকতে হবে। সচেতন থাকতে হবে। সেখানেও এমন কিছু যেন না করা হয় যার প্রভাব আমাদের দেশে এসে পড়ে। আমাদের সনাতন সম্প্রদায়ের উপর আঘাত আসে।' আর ১৯৯২-এর অক্টোবরে তাঁর বক্তব্য ছিল ঃ 'শেখ হাসিনা সেদিন বলেছেন ভারতের চৌদ্দ কোটি মুসলমানের জানমাল রক্ষা করবার খাতিরে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে'। মাঝখানে চার-চারটে দশকের ব্যবধান ঘটে গেলেও বক্তব্যের মূল সুরের কিন্তু কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এ বিষয়ে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুরঞ্জনের মূল্যায়নটি এরকম ঃ

শেখ হাসিনাকে কেন ভারতের মুসলমানের নিরাপত্তার কথা আগে ভাবতে হয়? এদেশের মানুষের নাগরিক অধিকারের কারণেই কি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা জরুরি নয়? নিজ দেশের নাগরিকের জানমালের চেয়ে ভারতীয় মুসলমানের জানমালের প্রতি দরদ বেশি দেখাতে হয় কেন? তবে কি ধরে নিতে হবে জামাতি ইসলামি যে 'ভারত বিরোধিতা ও ইসলাম' মশলায় আজ রান্না চড়াচ্ছে জনগণকে গেলাবে বলে, সেই মশলা আওয়ামি লিগকেও ব্যবহার করতে হচ্ছে? এও কি কমিউনিস্টদের ইসলামি মুখোশ পরবার কৌশল? আওয়ামি লিগ বা কমিউনিস্ট পার্টি যারা দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুভোট চিরাচরিতভাবে পেয়ে থাকে তারাও তাদের নিরাপত্তা, সমান অধিকারের বিষয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয় আর তাদের বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কথা না বলাই ভালো। ক্ষমতায় থাকাকালীন তারাই এদেশের জেহাদি শক্তির মূল আশ্রয়দাতা ছিল। এ কারণে এ বছরও ২০২২ সালেও ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ে হিন্দুদের দুর্গাপূজা করতে হয়েছে; তবুও হামলার ঘটনা এড়ানো যায়নি।

একজন সংখ্যালঘু শিশু যদি জন্মাবধি দেখে বিশেষ ধর্ম পরিচয়ের কারণে সে ক্রমশ আলাদা হয়ে উঠছে; জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তার সংস্কৃতি, রীতিনীতির সঙ্গে আপোশ করতে হচ্ছে তাহলে তখন থেকেই তার মধ্যে গড়ে উঠবে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ, ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স। ঢাকা শহরের মেয়েদের নামি স্কুল ভিকারুন্নেসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ। কিছুদিন আগে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল সেখানকার মেয়েদের 'আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম' শীর্ষক একটি জনপ্রিয় গানের ভিডিয়ো। ক্যামেরায় তাদের প্রাণোচ্ছল স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ প্রকাশিত হয়েছে। ঘটনাচক্রে সুরঞ্জনের বোন মায়ার ছাত্রী মিনতিও এই স্কুলের ছাত্রী ছিল। এই প্রসঙ্গে মায়া ও মিনতির একটি কথোপকথন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

মায়া ভিখারুন্নেসা স্কুলে পড়ত। একদিন সে মিনতিকে অঙ্ক করাতে গিয়ে লক্ষ্য করল মিনতি পেন্সিল নাড়ছে আর বলছে আলহামদুলিল্লাহির রাহমানির রাহিম, আর রাহমানির রাহিম।

মায়া অবাক হয়ে বলেছিল— এসব কী বলছ তুমি?

মিনতি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল— আমাদের অ্যাসেম্বলিতে সুরা পড়া হয়।

—তাই নাকি? অ্যাসেম্বলিতে সুরা পড়ে ভিখারুন্নেসায়?

—দুটো সুরা পড়া হয়। তারপর জাতীয় সংগীত।

—সুরা যখন পড়ে, কী কর তুমি?

—আমিও পড়ি। মাথায় ওড়না দিই।

—স্কুলে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানদের জন্য কোনও প্রেয়ার নেই?

—না।

সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগুরুর সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের সূচনা ঘটেছে আক্ষরিক অর্থেই জন্মলগ্ন থেকে। সে কারণেই হয়তো 'জন্ম যেথা আজন্ম পাপ' কিংবা 'জন্ম থেকে জ্বলছি'র মতো কালোত্তীর্ণ স্লোগানের মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘু নিপীড়নের নিখাদ সত্যটি ফুটে ওঠে। মায়ার আরেক ছাত্রী ছিল তার নাম সুমাইয়া। মেয়েটি আবার তারই বন্ধু পারুলের আত্মীয়া। সেই ছাত্রী হঠাৎ একদিন মায়াকে বলে—

'দিদি আপনার কাছে আর পড়ব না

—কেন?

—আব্বা বলেছেন একজন মুসলমান টিচার রাখবেন।

—ও আচ্ছা।

অথচ সুধাময় কন্যা, সুরঞ্জন ভগিনী মায়া আশৈশব শিক্ষা পেয়েছে 'মানুষ' হওয়ার, 'হিন্দু' হওয়ার নয়। এতখানিই 'মানুষ' যে শৈশবে দাদার কাছে পুজো দেখতে যাওয়ার বায়না করলে সুরঞ্জন বলত, 'মানুষ হ, হিন্দু না'। মায়া হেসে উত্তর করত : 'কেন হিন্দুরা কি মানুষ নয়?' বিরানব্বইয়ের ডিসেম্বরে এই মায়াই অপহৃত হয় আর কখনো বাড়ি ফিরে আসেনি। সুরঞ্জন বিশ্বাস করে তার বোনের দেহটি লোহারপুল এর নীচে মরে পড়ে থাকবে, সে আর কখনো ফিরে আসবে না।

যে মানসিক উৎকর্ষতা রুচিশীলতার প্রমাণ সুরঞ্জন চরিত্রটি উপন্যাস জুড়ে দিয়ে এসেছিল, কালক্রমে সে এক প্রকার মনস্তাত্ত্বিক বিকারে ভোগে; স্বদেশকে গালি দিয়ে আত্মশ্লাঘা অনুভব করে। সংখ্যাগুরুর আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে তার অস্ত্র হয়ে ওঠে ধর্ষণ; একজন মুসলমান পতিতাকে ধর্ষণ করে সে যেন প্রতিশোধের স্বাদ পায়। উদার সহিষ্ণু যুক্তিবাদী সুরঞ্জন আর তার আজন্ম দেশপ্রেমিক পিতা 'ইন্ডিয়া'তে তাদের অন্তিম গন্তব্য খুঁজে পেয়েছিল। প্রকাশের চার দশক পরেও তসলিমার 'লজ্জা' আমাদের সামনে আয়না তুলে ধরে; আমরা যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকি, তাহলে তার দায় ও দায়িত্ব সর্বতোভাবে আমাদেরই।

(লেখক মহারাজ নন্দকুমার মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

অভিন্ন নাগরিক বিধি সফল করে তোলা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য

পার্থসারথী দেববর্মন

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিতর্ক নতুন নয় এই বিতর্ক দীর্ঘদিনের। এমনকী ব্রিটিশ শাসনের আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (১৭৫৭- ১৮৫৮) ভারতের স্থানীয় সামাজিক ও ধর্মীয় বিধির উপর পশ্চিমের পাশ্চাত্য ভাবনার প্রয়োগ করায় সচেষ্ট ছিল।

১৮৪০ সালের লেক্স লসির রিপোর্টে ভারতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির (বিশেষ ভাবে অপরাধমূলক আইন, এভিডেন্স সংক্রান্ত আইন এবং চুক্তি সংক্রান্ত আইন) গুরুত্ব ও প্রয়োজনের ওপর বিশেষ রেখাপাত করা হয়।

ব্রিটিশ শাসনকাল বিভেদের মাধ্যমে শাসন পদ্ধতি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রচলন করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীনতার ৭৫ বছর পালনকালেও ভারতবাসীর মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের প্রবর্তিত উপনিবেশিক ভিন্ন ভিন্ন আইন সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রচলিত আছে।

ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের সহাবস্থানের সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ ভারতে সমাজ ব্যবস্থা শাস্ত্রীয় ও গতানুগতিক আইনের বিভিন্নতা রক্ষা করে চলা হয়। সে কারণে বিভিন্ন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী ড. বি.আর. আম্বেদকর, যিনি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আইনের প্রস্তাব প্রবর্তক হিসেবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের তীব্র যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব রাখেন।

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা হলো সংবিধানের মূল ভিত্তি। ভারতীয় সংবিধান প্রত্যেক নাগরিকের জন্য সমান অধিকার, পদমর্যাদা ও সুযোগ সুবিধার (equality of status and of opportunity) নিশ্চিত করে। যা রক্ষা করা জাতি, ধর্ম, জন্মস্থান, ভাষা, কাল নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের সাংবিধানিক পবিত্র কর্তব্য।

ভারতীয় সংবিধানের অন্য মূল ভিত্তি চিন্তা, মত প্রকাশ, বিশ্বাস, আস্থা ও পূজার্চনা যথাযথ রক্ষার যুক্তিতে যে সকল নাগরিক,

আইনসভার সদস্য/সদস্যা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা আইসভায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নে বাধা প্রাপ্তি করার যুক্তি দিয়ে আলোচনা করছেন। প্রত্যেক সৎ নির্ভীক সংবিধানের সাম্যতার পক্ষে থাকা ভারতীয় নাগরিকের আশু আবশ্যিক কর্ম সেই সকল অসৎ, অধার্মিক সংবিধানের সাম্যতা বিরোধী নাগরিকের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপের মাধ্যমে অনতিবিলম্বে আইন সভায় পেশ করা ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিলকে সমর্থন জানিয়ে আইনের প্রণয়ন করার পক্ষে সকল বাধা বিপত্তি জয় করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া।

ইসলামি শরিয়া আইন ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় এক সময় প্রচলিত হয়। সে আইনে নাগরিকদের মধ্যে কোনোরূপ সাম্যতার অবস্থান ছিল না। শারিয়া আইনের অসাম্যতা তথা বিভেদের জন্যে আদালতে, বিশেষভাবে নিম্ন আদালতে শাসন প্রক্রিয়া চালনায় বিশেষ বাধার সৃষ্টি হয়। কিছু কিছু সম্প্রদায়কে বিভিন্ন প্রলভনে অথবা সুযোগের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে এবং কোথাও কোথাও ভীতি প্রদর্শন করে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তথাপি স্থানীয় মূল সংস্কৃতি প্রবহমান থাকায় শরিয়া আইনের প্রবর্তনে বিভিন্নতা বিরাজমান থাকে। সেই সকল স্থানীয় প্রথা প্রায়শই মহিলাদের অসাম্যের শিকার হতে বাধ্য করে। বিশেষ ভাবে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে, প্রায়শই সম্পত্তির বংশানুক্রমিক অধিকার এবং পণ প্রথার ব্যবস্থাপনায় অসাম্যের প্রভাব থাকে।

স্বাধীনোত্তর কালে ভারতীয় আইনসভায় ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ এবং আইনসভার মহিলা সদস্যগণ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের পক্ষে ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অংশের (পার্ট-৩) মৌলিক আইনের জাতি, ধর্ম, স্থান, কাল, জন্মস্থান, ভাষা নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের অভিন্ন আইনের শাসনের অধিকার নিশ্চিত করে। ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন ব্যতিত কোনোরূপ উপায় নেই।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নে বর্তমান আইনসভার প্রচেষ্টা, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির সকল ও সর্বতোকৃষ্ট পদক্ষেপ হবে। সকল নির্ভীক, ধার্মিক, দেশাত্ববোধক, ভারতীয় নাগরিকের বহুদিনের চাহিদা পুরণের মাধ্যমে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়ন সংবিধানের সাম্যের রক্ষার অতীব জরুরি।

(লেখক বিশিষ্ট আইনজীবী)

মিসিং লিংক

শ্রীলঙ্কায় রাবণ কোনওভাবেই ভিলেন নন

সন্দীপ চক্রবর্তী

সাহিত্যে অ্যান্টি-হিরো বা প্রতিনায়ক কথাটি বহুল প্রচলিত। প্রতিনায়ক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভিলেন বা খলনায়কে পর্যবসিত হন। আমাদের রাবণ এমনই একজন সর্বজনমান্য খলনায়ক। কারণ তিনি বনচারী এক অসহায় মহিলাকে অন্যায়ভাবে অপহরণ করেছিলেন। এর জন্য তার সাধের স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তিনি ও তার পরিবারের সকল পুরুষ (বিভীষণ ব্যতীত) শ্রীরামের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। ভারতে রাবণের ভাবমূর্তি ভিলেনের হলেও শ্রীলঙ্কায় কিন্তু আদপেই সেরকম নয়। যদিও রামায়ণে বর্ণিত লঙ্কাপুরীই আজকের শ্রীলঙ্কা কিনা— সে প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত। কিন্তু শ্রীলঙ্কার মানুষ বিশ্বাস করেন তাদের দেশেই ছিল রামায়ণের লঙ্কাপুরী এবং রাবণ ছিলেন তাদের রাজা। বিশ্বাসের স্বপক্ষে তারা অশোকবনের উদাহরণ দেন। শ্রীলঙ্কায় অশোকবনের কথা অনেকেই জানেন। শ্রীলঙ্কার সরকার সে দেশের প্রত্নতাত্ত্বিকদের দিয়ে যে গবেষণা করিয়েছিলেন তাতে জানা গেছে এই অশোকবনেই সীতাকে বন্দি করে রেখেছিলেন রাবণ। রামায়ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হলো সিগিরিয়া। এখানে ছিল রাবণের দুর্গ। পরে কখনও সিগিরিয়া নিয়ে বিশদে আলোচনা করা যাবে। আপাতত যেটা জানা দরকার ঠিক কী কারণে শ্রীলঙ্কার মানুষ রাবণকে এতটা উচ্চ আসন দেন।

রামায়ণ রাবণকে ব্রাহ্মণ বলেছে, জ্ঞানের ভাণ্ডার বলেছে। সেই জ্ঞানের গভীরতা এমনই যে এক মাথায় ধরে না। তাই রাবণের দশটি মাথা। সেই সঙ্গে তিনি মহাশক্তিশালীও। এতটাই শক্তিশালী যে দুটি হাত যথেষ্ট নয়। কুড়িটি হাত প্রয়োজন। বলাবাহুল্য, এসব রূপক। বাস্তবে এরকম কোনও মানুষ থাকতে পারেন না যার দশটি মাথা বা কুড়িটি হাত। কিন্তু এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রাবণের ছিল যার জন্য তাকে অতিমানব হিসেবে ভাবতে দ্বিধাবোধ করেননি স্বয়ং বাল্মীকিও। প্রশ্ন হলো কী সেই বৈশিষ্ট্য?

রাবণের পিতা পুলস্ত্য ও মাতামহ মাল্যবান দু'জনেই ছিলেন জ্ঞানী পুরুষ।

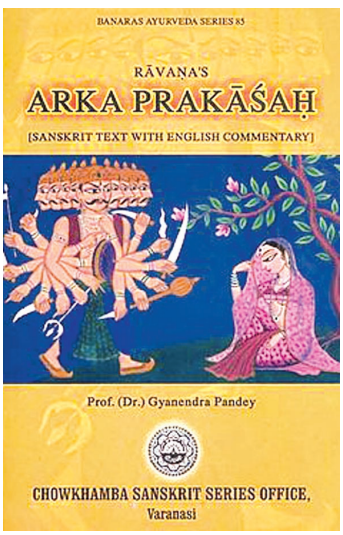

রাবণও বংশগতির সেই ধারায় পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। রাবণের রাজসভা অলংকৃত করতেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা। রাবণ নিজেও বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যদিও এইসব গ্রন্থের কয়েকটি মাত্রই এখন পাওয়া যায়। এই তথ্য আমাদের জানিয়েছেন ডাঃ সি.পি. শর্মা। পেশাগত পরিচয়ে তিনি উদয়পুরের এম.এম.এস গভর্নমেন্ট আয়ুর্বেদ কলেজের দ্রব্যগুণ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। এর পাশাপাশি তিনি শ্রীলঙ্কার কেলানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের প্রাক্তন অ্যাসিস্ট্যান্ট কো-অরডিনেটর। ডাক্তার শর্মার বহুচর্চিত গবেষণাপত্রটির নাম রাবণ : আ গ্রেট স্কলার অ্যান্ড সায়েন্টিস্ট।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডাঃ সি.পি. শর্মা তাঁর গবেষণাপত্রে যে তথ্য দিয়েছেন তা শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে রাবণ-সম্পর্কিত তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে যুগে রাবণ ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক। চিকিৎসা বিজ্ঞানের (আয়ুর্বেদ) বিভিন্ন বিষয়ে রাবণ সংস্কৃত ভাষায় একাধিক গ্রন্থও রচনা করেছেন। আয়ুর্বেদকে শুধুমাত্র ওষুধপত্রের ব্যবস্থা না বলে একটি সম্পূর্ণ জীবন বিজ্ঞান বলাই যুক্তিসংগত। একজন

দক্ষ চিকিৎসক হওয়ার ফলে রাবণও কথাটা জানতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলিতে মোটামুটি এই ব্যাপারটাই পাওয়া যায়। তাঁর যেসব গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় সেগুলি হলো, অর্কপ্রকাশ, নাড়িপ্রকাশ, কৌমারতন্ত্র, বিধিবৈদ্যক ও মর্মবিজ্ঞান। অর্কপ্রকাশের বিষয় দ্রব্যগুণবিজ্ঞান ও রসশাস্ত্র বা ভৈষজ কল্পনা। আধুনিক সময়ে এই ভৈষজ কল্পনাকে Pharmocology ও Pharmacy নামে অভিহিত করা হয় আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ রাবণের এইসব গুণপনার কথা না জানলেও অর্কপ্রকাশ নামের বইটি কিন্তু এখনও ভারতে পাওয়া যায়। বইটির প্রকাশক কিষণলাল দ্বারকাপ্রসাদ, মুম্বাই। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষায় বইটি লেখা হয়েছে। গ্রন্থটি মোট দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ে রয়েছে একশোটি করে শ্লোক। বিভিন্ন ভেষজের বৈশিষ্ট্য এবং এইসব ভেষজের টিঙ্কচার একস্ট্র্যাক্ট তৈরির পদ্ধতি ও রোগীদের ওপর কীভাবে তা প্রয়োগ করা হবে তার বিশদ বর্ণনা রয়েছে এইসব শ্লোকে। মানুষ কীভাবে রোগমুক্ত হবে— মন্দোদরীর এই প্রশ্নের উত্তরে রাবণ পাঁচ রকমের ভেষজের কথা জানিয়েছেন— লতা, গুল্ম, শাখী, পাদপ ও প্রসার। পাঁচ রকমের ওষুধ প্রস্তুত হয় স্বরস (Expressed Juice), কল্ক (Paste), চূর্ণ (Powder), তৈল (Medicated Oil) ও অর্ক (Extracted Tinctures) থেকে। ভেষজের নির্যাস থেকে টিঙ্কচার তৈরির ব্যাপারে রাবণ অর্ককল্পনাকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন।

অর্কপ্রকাশ গ্রন্থে রাবণ বিভিন্ন ভেষজের অর্ক বা আরক কীভাবে তৈরি করতে হবে তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। ভেষজকে কীভাবে শুদ্ধ করতে হবে, বিষাক্ত ভেষজ থেকে বিষ কীভাবে বাদ দিতে হবে— এমনকী প্রাণীজ উপকরণকে কীভাবে ওষুধের উপাদান হিসেবে উপযোগী করে তুলতে হবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে এই গ্রন্থে। ফার্মাকোলজি ও ফার্মেসিতে রাবণের দক্ষতার পরিচয় আমরা পাই এই গ্রন্থে।

নাড়িপ্রকাশ গ্রন্থটি রচিত হয়েছে মূলত রোগনিদানের (রোগনির্ণয়) কথা মাথায় রেখে। এই গ্রন্থ ভারতে প্রকাশ করেছেন বারাণসীর চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস। টীকাভাষ্য লিখেছেন পণ্ডিত ভীমশঙ্কর মিশ্র। রোগনির্ণয়ের জন্য রাবণ মানব শরীরের আটটি অংশ (এর মধ্যে শরীরের বর্জ্য পদার্থও আছে) বেছে নিয়েছেন। এগুলি হলো— নাড়ি, মূত্র, মল, জিহ্বা, শব্দ, স্পর্শ, নেত্র ও আকৃতি। নাড়ি কতরকম ভাবে দেখা যায় রাবণ তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উদ্ধৃত করেছেন এই বিদ্যার জনক নাড়িবৈদ্য শ্রীনন্দীকে। রাবণ লিখেছেন, ভালো চিকিৎসক হতে হলে পুঁথিগত বিদ্যাই যথেষ্ট নয়, যথার্থ হাতেকলমে প্রশিক্ষণও জরুরি।'

রাবণের কৌমারতন্ত্রের বিষয়ে শিশু চিকিৎসা। সদ্যোজাত শিশুর পরিচর্যা, শিশুর উপযোগী খাবার, শিশুর অসুখবিসুখ ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বর্ণনা করেছেন রাবণ। চিকিৎসকের কাজ ভারতে কোনওদিনই পেশা হিসেবে গণ্য হয়নি। পীড়িত মানুষের প্রতি সেবার ভাবনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন ভারতীয় চিকিৎসকেরা। বলাবাহুল্য, রাবণও তাঁর ব্যতিক্রম ছিলেন না। কৌমারতন্ত্র গ্রন্থে রাবণ নানান অসুখের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন সূত্রের সন্ধান দিয়েছেন। যেসব মা সন্তানকে স্তন্যপান করান তাদের বুকে যাতে পর্যাপ্ত দুধ থাকে তার জন্য শতাভরী (Asparagus Recemosus) ওষধী প্রয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন রাবণ। এ ব্যাপারে ধাত্রী (Woodfordia Fructicosa) ও গুধালও (হলুদ, লিটমাস চীনা গোলাপের পাঁপড়ি) যথেষ্ট কার্যকরী। বাচ্চাদের ডায়েরিয়ার প্রতিকারে আফিঙের বীজের নিদান দিয়েছেন রাবণ। চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত রাবণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ মর্মবিজ্ঞান। সংস্কৃতে মর্ম বলতে মানবশরীরের কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে বোঝায়। শল্য চিকিৎসার জনক সুশ্রুত বলেছেন মর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকলে শল্যচিকিৎসক হওয়া যায় না। মর্ম সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করায় অনুমান করা যেতে পারে রাবণ একজন দক্ষ শল্যচিকিৎসকও ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, মর্মবিজ্ঞানের যে কপিটি পাওয়া গেছে তা প্রায় পড়াই যায় না। সুতরাং, মর্মবিজ্ঞানের মর্মোদ্ধার করা সম্ভব হলো না। তবে একটা কথা স্পষ্ট, সে যুগের চিকিৎসাশাস্ত্রে এমন কোনও বিষয় ছিল না যা রাবণ জানতেন না।

এবার একটু অন্য প্রসঙ্গ। রাবণের বিধিবৈদ্যক গ্রন্থটি কিন্তু চিকিৎসা সংক্রান্ত নয়। এটি আইনশাস্ত্রের বই। যদিও চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত কিছু বিষয় আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। যেমন— স্বাস্থ্যনীতি ও চিকিৎসকদের আচরণবিধি কেমন হওয়া উচিত। চিকিৎসকেরা কীভাবে দেশের আইনব্যবস্থা ও প্রশাসনের স্বার্থ রক্ষা করতে পারেন তার উদাহরণ দিয়েছেন রাবণ। দুর্ঘটনা ও বিষপ্রয়োগে মৃতদের পরীক্ষা কেমন করে করতে হবে তার দিশানির্দেশ মেলে এই গ্রন্থে। ভাবতে অবাক লাগে, আজ থেকে আনুমানিক সাত হাজার বছর আগেও খাবারের বিষ মেশানো হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রচলিত ছিল এ দেশে।

যে সময়ের কথা সেই সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে চারটি জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য ছিল— আর্য, যক্ষ, রক্ষ (বা রাক্ষস) ও গন্ধর্ব। আর্যরা বেদানুসারী এবং গৃহস্থ জীবনে অভ্যস্ত। যক্ষরা ছিল ধনী। গন্ধর্বরা সাধারণভাবে শিল্পী সম্প্রদায়। রাক্ষসেরা ছিল মারাত্মক যোদ্ধা এবং রাবণ ছিলেন রাক্ষসদের অবিসংবাদী নেতা। রাবণ চেয়েছিলেন অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করে একনায়ক হয়ে উঠতে। তাকে সাম্রাজ্যবাদী বললেও অতিশয়োক্তি হয় না। হ্যাঁ, এই দৃষ্টিকোণ সর্বার্থেই ভারতীয়। শ্রীলঙ্কার মানুষ রাবণকে তাদের জাতীয় নায়ক বলে মনে করেন। শ্রীলঙ্কার উপগ্রহের নামও দেওয়া হয়েছে রাবণের নামে। তাদের মতে রাম-রাবণের যুদ্ধের জন্য রাবণ দায়ী ছিলেন না। দায়ী ছিলেন লক্ষ্মণ। রাবণ শুধু তাঁর ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। যাইহোক, এই তর্ক চলতেই থাকবে। আমরা বরং অন্য একটা সিদ্ধান্তে এই নিবন্ধ শেষ করি। শ্রীলঙ্কার মানুষ রাবণকে ঐতিহাসিক বলে বিশ্বাস করেন বলেই তাঁকে জাতীয় নায়ক ভাবতে পারেন। তাহলে আমরা কেন শ্রীরামকে ঐতিহাসিক ভাবতে পারি না? □

হাজি মহম্মদ মহসিনের দানধ্যানের সবটাই মুসলমানদের জন্য

বিনয়ভূষণ দাশ

প্রায় বছর দশেক আগে হাজি মহম্মদ সম্পর্কে কাজি মাসুম আখতারের লেখা একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। প্রবন্ধটির নাম, যতদূর মনে পড়ে, 'আমরা ভুলেই থাকব'। এছাড়া সেই সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকার 'কলকাতার কড়চায়' 'স্মরণীয়' বলে একটা লেখাও বেরিয়েছিল। আমরা প্রায় সকলেই আমাদের বিদ্যালয় জীবনে 'দানবীর হাজি মহম্মদ' সম্পর্কে রচনা লিখেছি। তারপরে আর সেভাবে হাজি মহম্মদ সম্পর্কে তেমন চর্চাও করা হয়নি। অথচ হাজি মহম্মদ মহসিন স্মরণীয় এক ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে পরিচিত। সুতরাং ঐতিহাসিক ভাবেই তাঁর দান ও অন্যান্য কার্যকলাপ পর্যালোচনার দাবি রাখে। কাজি মাসুম আখতার তাঁর ওই পূর্বোক্ত রচনায় তাঁকে রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে একাসনে বসাতে চেয়েছেন। কাজি মাসুম আখতার ওই প্রবন্ধে বলেছেন, 'যার একদিকে রয়েছে ধার্মিকতা, উদারতা, মানবতা, অন্যদিকে প্রগতিশীলতা, পাণ্ডিত্য, শিক্ষানুরাগ।' আবার অন্যত্র লিখেছেন, 'মহসিন তাঁর বিশাল ভূ-সম্পত্তি মূলত মুসলমানদের আর্থিক ও শিক্ষাগত কল্যাণে দান করেন।' একসময় নিতান্ত রাজনৈতিক কারণেই অনেককে নানা ভাবে মহান বানানো হয়েছে, আবার কাউকে কোনো কারণ ছাড়াই দুর্নামের পঙ্কে নিমজ্জিত করা হয়েছে।

তাই, কাজি মাসুমের এই মন্তব্য দুটি একটু বিশেষভাবে অনুধাবন করা দরকার। মন্তব্য দুটি একটু বিশ্লেষণ করলেই তাঁর মন্তব্যের স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। মহম্মদ মহসিনের চরিত্রের স্ব-বিরোধিতার দিকটিও পরিষ্কার বোঝা যায় এবং কাজি মাসুম আখতারের পূর্বোক্ত উক্তির সারবত্তাও ভুল প্রমাণিত হয়ে যায়। প্রসঙ্গটি একটু আলোচনা করা যাক। বলা হয়েছে, তিনি তাঁর বিশাল ভূ-সম্পত্তি দান করেন। এবং বলা প্রয়োজন, এই তথাকথিত দানের জন্যই তিনি বিখ্যাত। এই প্রসঙ্গে সংসদ বাঙ্গালি চরিতাভিধান থেকে উদ্ধৃতি দিলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সেখানে হাজি মহম্মদ মহসিন সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'পিতা পারস্যদেশীয় বণিক হাজি ফৈজুল্লা। মহসিনের মাতা নদীয়া ও যশোহরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জায়গীরের অধিকারী আগা মোতাহারের পত্নী ছিলেন। এঁরাও পারস্যদেশের ইস্পাহান থেকে আগত।' অথচ, হাজি মহম্মদ মহসিনকে বাঙ্গালি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যাইহোক, আগা মোতাহারের মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী জয়নাব বেগম তাঁদের আত্মীয়,

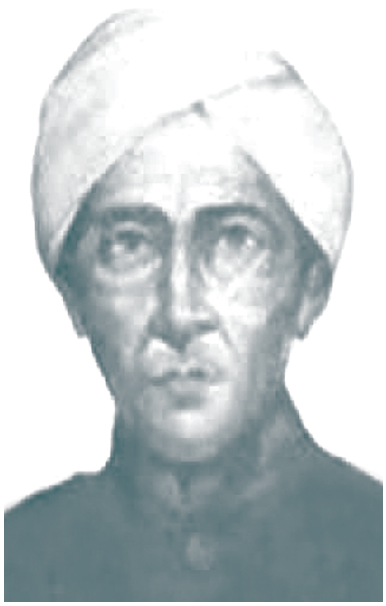

পারস্য দেশের ইস্পাহানের বাসিন্দা হাজি ফৈজুল্লাকে নিকা করেন। মোতাহারের কন্যা মন্নুজান খাতুন বিশাল পিতৃ সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে মন্নুজান ওই সম্পত্তির অধিকারী হন। তাছাড়া মন্নুজানের বিয়ে হয়েছিল সৈয়দপুরের জমিদার ও বাঙ্গলার নবাব আলিবর্দি খাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র মির্জা সালাহ্উদ্দিনের সঙ্গে। সালাহ্উদ্দিনের মৃত্যুর পরে তাঁর বিশাল জমিদারির উত্তরাধিকারী হন মন্নুজান। বৈমাত্রেয় বোন মন্নুজান হাজি মহম্মদ মহসিনকে হুগলীতে ডেকে নিজের বিশাল জমিদারির ভার তাঁর হাতে তুলে দেন যখন তাঁর বয়স সত্তর। সেই বয়সে তাঁর পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভবও ছিল না। স্বোপার্জিত কোনো অর্থ তাঁর ছিল না; ভবঘুরে হয়েই জীবন কাটছিল তাঁর। নেহাত ভাগ্যের জোরে মহসিন এক বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে যান। অবশ্য তাঁর এই সম্পত্তি পাওয়ার অথবা বলা ভালো, এই সম্পত্তি হস্তগত করারও ইতিহাস আছে। তাঁর বৈমাত্রেয় বোন মন্নুজান প্রথমে বন্দালি খাঁকে পোষ্যপুত্র হিসেবে দত্তক গ্রহণ করেন। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' সমাচার দর্পণ থেকে উদ্ধৃত করে লিখেছে, 'উক্ত বেগম স্বামীর মরণান্তর বন্দালি খাঁকে পোষ্যপুত্র করিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে উক্ত বেগম ওই ভ্রাতা হাজি মহম্মদ মহসিনের কোনো স্থানে সন্ধান পাইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বহু যত্নবিধানে আনাইয়া কহিলেন যে, আমার পোষ্যপুত্র এই বন্দালির বয়ঃপ্রাপ্ত পর্যন্ত তুমি এমামবাটির বিষয় সমুদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করহ। হাজি ওই মতে অভিমত হইয়া এমামবাটির কর্তা হইয়া কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবসানন্তরে বেগম ওই

বন্দালি নামক পোষ্যপুত্রটি রাখিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইলে বন্দালি খাঁ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ওই আপন মাতৃবিষয় পাইবার ইচ্ছায় জিলা এবং সদর এবং বিলাত পর্যন্তও মোকদ্দমা করিয়া ওই বেগমকৃত পোষ্যপুত্র মহম্মদের শাস্ত্রানুসারে কোনো স্থানেই গ্রাহ্য না হওয়াতে জয়ী হইতে পারেন নাই। তাহাতে হাজি জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া নিষ্কণ্টকে এমামবাটির সমুদায়ের পূর্ববৎ কর্তা থাকিয়া এমামবাটির কর্তব্য কর্মসকল সাধন করিতে লাগিলেন।'

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে শুধু সৌভাগ্যের জোরে নয়, মন্নুজানের পোষ্যপুত্র বন্দালি খাঁকে বঞ্চিত করেই হাজি মহম্মদ মহসিন এই বিশাল সম্পত্তি হাসিল করেন। যেহেতু তাঁর এবং তাঁর সৎবোনের কোনো উত্তরাধিকারী ছিল না, তাই হাজি মহম্মদ মহসিন তাঁর সম্পত্তি 'ওয়াকফ' হিসেবে ঘোষণা করেন ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে এবং তাঁর অত্যন্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত দুই অনুচর রজব আলি খাঁ ও শাকের আলি খাঁকে ওই সম্পত্তির দুই মোতয়ালি নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে এই দুজনের দুইপুত্র যথাক্রমে বাকের আলি খাঁ ও ওয়াসেক আলি খাঁকে তাঁদের পিতারা সরকারের বিনা অনুমতিতেই মোতোয়ালি নিযুক্ত করেন। তাঁরা তৌলিয়তনামার নানা বরখেলাপ বাইনাচ, গীতবাদ্য প্রভৃতি অত্যাচার করতে লাগলেন। তাঁদের এই অত্যাচার ও অর্থের নয়ছয় করা ইংরেজ সরকারের গোচরে এলে গভর্নর কাউন্সিলের আজ্ঞানুসারে ১২২৫ বঙ্গাব্দের ২৫ আশ্বিন তাঁরা পদচ্যুত হন। হাজি মহম্মদ মহসিনের মৃত্যু হয় ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি তাঁর জীবৎকালে কেবলমাত্র কিছু লঙ্গরখানা স্থাপন করেছিলেন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়, আর হুগলির ইমামবাড়া মন্নুজানের পরিবার আগেই স্থাপন করেছিল। হুগলি ইমামবাড়ার কিছু খরচও তাঁর করা ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে ব্যয় হতো। তিনি তাঁর জীবৎকালে যে ট্রাস্ট ডিড করেছিলেন সেই সম্পত্তি থেকে আয়ের সমস্ত অর্থই ব্যয়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন শুধুমাত্র মুসলমানদের কল্যাণে।

ফলে তিনি যা কিছু করেছেন সবই পরের ধনে পোদ্দারি। তাও আবার সম্প্রদায়গত কল্যাণে। তিনি দানবীর বলে খ্যাত, কিন্তু কার টাকায় এই দান? তাঁর নিজের আয় করা অর্থে কোনোমতেই নয়। তাঁর সৎবোনের কাছ থেকে প্রাপ্ত অথবা হাতানো অর্থ থেকে তিনি যা' কিছু নিজের জীবিতকালে দান করেছেন বা খরচ করেছেন অথবা ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে কৃত 'ট্রাস্ট-ডিড'-এর মাধ্যমে মৃত্যুর পরে খরচের যে নির্দেশ তিনি দিয়ে গেছেন সে সবই হুগলি ইমামবাড়ার রক্ষণাবেক্ষণ, যাবতীয় ইসলামি পরবের ব্যয়-নির্বাহ, স্থানীয় মোসলেম গোরস্থানের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি বিষয়ে। শিক্ষার প্রসার, এমনকী মুসলমান ছাত্রদের জন্য মাদ্রাসা স্থাপন বা হোস্টেল নির্মাণেও তিনি এক কপর্দক ব্যয় তো করেনইনি, কোনো নির্দেশও রেখে যাননি।' (অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়শ্রী পত্রিকা, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার সংখ্যা)। তাঁর ট্রাস্ট ডিডের কপি পাওয়া যায়। সেই ডিডে তিনি কেবলমাত্র মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয়ের কথাই বলেছেন।

অর্থাৎ পরের ধনে পোদ্দারি, আবার সেখানেও চরম সাম্প্রদায়িকতা। এখানে কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের উইলের কথা উল্লেখ করা যায়। সেই উইলে কৃষ্ণনাথের উদার, অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সেখানে সমস্ত নাগরিক সাধারণের জন্য সাধারণ শিক্ষা, অর্থাৎ বিজ্ঞান, আধুনিক শিক্ষা, আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। উল্লেখ করা যায় কলুটোলার মতিলাল শীলের দানের কথাও।

হাজি মহম্মদ মহসিন লোকান্তরিত হন ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর আগে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে করা 'তৌলিয়তনামায়' তিনি দুজন ম্যানেজার নিযুক্ত করে যান। কিন্তু তাঁর বেপরোয়া অর্থ তছরূপ, জালিয়াতি ইত্যাদি নানা অপকর্মের দ্বারা ট্রাস্টের সম্পত্তি প্রায় লাটে তোলার উপক্রম করেন। তখন ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে এই বিষয়ে সরকার হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয় এবং ব্রিটিশ গভর্নর চার্লস মেটকাফের হস্তক্ষেপে গঠিত হয় 'মহসিন শিক্ষা তহবিল'। ইংরেজ সরকারের নির্দেশে এবং মূলত মেটকাফের উদ্যোগে এই তহবিলের টাকায় ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয় নিউ হুগলি কলেজ। এই কলেজের শতবর্ষে কলেজের নাম পরিবর্তন করে 'হুগলি মহসিন কলেজ' করা হয় ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে।

প্রথমদিকে সরকারি নির্দেশে 'মহসিন শিক্ষা তহবিলের' অর্থ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব ছাত্রের জন্য খরচ করার কথা থাকলেও ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের এক নির্দেশনামায় কেবলমাত্র মুসলমান ছাত্রদের জন্যই এই অর্থ ব্যয় করা হয়। এই সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা চলছে আজ অবধি। এই ট্রাস্টের উদ্যোগে শিক্ষা বিস্তার শুরু হয় শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য। এই ট্রাস্টের উদ্যোগেই হুগলিতে হাসপাতালও স্থাপিত হয়।

হুগলি ইমামবাড়া প্রাঙ্গণে মাদ্রাসা এবং তার সংলগ্ন ছাত্রাবাস স্থাপিত হয় মুসলমান ছাত্রদের জন্য এবং এগুলিও সরকারি উদ্যোগের ফল। শিক্ষা ও সমাজসেবা সংক্রান্ত সমস্ত কাজগুলিই তৎকালীন সরকারি উদ্যোগের ফল। সুতরাং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-সংক্রান্ত কাজগুলির কৃতিত্ব কিছুতেই হাজি মহম্মদ মহসিনকে দেওয়া যায় না— তা' শুধু মুসলমানদের জন্য হলেও। এক্ষেত্রে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। তিনি তাঁর জীবৎদশায় শুধুমাত্র কিছু লঙ্গরখানা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এ সকল তথ্যের আলোকে হাজি মহম্মদ মহসিনকে মানবপ্রেমিক দানবীর আখ্যায় আখ্যায়িত করা যায় কি? নাকি তাঁর মতো সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন একজনকে আলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী, দানের সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে তুলনা করে বাঙ্গলার শিক্ষার ইতিহাসকে বিকৃত করা চলতেই থাকবে? অথবা নিদেনপক্ষে কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ বা কলকাতার মতিলাল শীলের সঙ্গে তুলনীয় তাঁর দানশীলতা? □

ধর্মান্তরকরণ এখনো চলছে

গত ৫ ডিসেম্বর স্বস্তিকা পত্রিকায় আন্তর্জাতিক বিভাগে লেখক নিখিল চিত্রকরের লেখা 'উত্তর-পূর্বে টাকার লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরকরণ' পড়ে খুব ভালো লাগল। খ্রিস্টান মিশনারি সম্প্রদায় ও মুসলমান সম্প্রদায় অনেক বছর আগে থেকেই এই কাজে লিপ্ত রয়েছে। প্রায় ১৫০০ সালের পর থেকেই কিছু খ্রিস্টান যাজক হিন্দুধর্মের গরিব ও অসহায় মানুষকে টাকার লোভ দেখিয়ে বা তাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে খ্রিস্টান করে চলেছে। অপরদিকে কিছু মুসলমান জোর করে হিন্দুধর্মকে শেষ করার লক্ষ্যে তাদের ধর্মান্তরকরণ করে চলেছে। দুই সম্প্রদায় খ্রিস্টান ও মুসলমানরা হিন্দুধর্মের মেয়েদের বা ছেলেদের এই দুই ধর্মে ধর্মান্তরকরণ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নিজ নিজ ধর্মকে প্রসারিত করে চলেছেন। শুধুমাত্র ভারতের উত্তর-পূর্বেই নয়, বাংলাদেশ ও তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর উপর তাদের ধর্মান্তরকরণের প্রভাব নিত্য দিনই চলছে। কোথাও টাকার লোভ দেখিয়ে, কোথাও খাদ্য ও বস্ত্রের লোক দেখিয়ে বা কোথাও লাভজেহাদের মাধ্যমে হিন্দুধর্মকে শেষ করে তাদের ধর্মকে প্রসারিত করার চেষ্টা করছে। এই দুই সম্প্রদায়ের একটাই লক্ষ্য, হিন্দুদের শেষ করা। সনাতন হিন্দুধর্মের উপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় থেকেই এই ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়া চলে আসছে। কিছু রাজনৈতিক নেতা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্মান্তরকরণে মদত দিয়ে চলেছেন। জনগণকে সচেতন না করলে অদূর ভবিষ্যতে অনেক বড়ো বিপদের সামনে হিন্দুধর্ম পড়বে নিশ্চিত।

—সঞ্জয় ব্যানার্জী,
চুঁচুড়া, ব্যারাক রোড, হুগলী।

জনগণনা বন্ধ কেন?

না, ভারত ঘোষিত হিন্দু দেশ নয়, তবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। পৃথিবীতে খ্রিস্টান দেশ আছে ১০২টি, খ্রিস্টান জনসংখ্যা ২৩৯ কোটি বা আরও কিছু বেশি। মুসলমান দেশ আছে ৫৮টি। মুসলমান জনসংখ্যা ১৯৫ কোটি বা আরও কিছু বেশি। বৌদ্ধদেশ আছে ৮টি, বৌদ্ধ জনসংখ্যা ৭৫ কোটি। ইহুদি দেশ ১টি, ইহুদি জনসংখ্যা ১.৪ কোটি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় একটিও হিন্দু দেশ নেই। কিন্তু কেন? ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ঘোষণা করা হয়েছে কী কারণে? প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক নয় কি? ভারতে ক্রমাগত পার্শ্ববর্তী দেশগুলি থেকে অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে। কারণ পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে কর্মসংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ নেই। ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাসস্থান এবং অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য তাদের অনেকেই বেআইনিভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করছে ভিসা পাসপোর্ট ছাড়াই। যারা ভিসা পাসপোর্ট নিয়েই চিকিৎসা বা অন্য কারণে ভারতে প্রবেশ করছে তাদের অনেকেই ভিসা পাসপোর্ট ছিঁড়ে ফেলে এদেশের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জনগণের মধ্যে মিশে যাচ্ছে। এ দেশে তাদের সাহায্য করার লোকের অভাব হচ্ছে না। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তারা এদেশের নাগরিক হয়ে যাচ্ছে। বাসস্থান, কর্ম সংস্থান সব কিছুই তাদের কাছে সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছে। ফলে দেশের জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইংরেজ শাসনকাল থেকেই ভারতে প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনা হয়ে আসছে। অথচ কোনও অজানা কারণে ২০১১ সালের পর থেকে এদেশে জনগণনা বন্ধ আছে। ২০২১ সালে জনগণনা হওয়ার কথা থাকলেও ২০২২ সালেও সরকার মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছে। রহস্যটা কোথায়?

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

মাঝে মাঝে মুখবদল

প্রথমেই বলি, আমি সুন্দর মৌলিকের লেখার ভক্ত। স্বস্তিকা হাতে পাওয়ার পর গোড়াতেই চোখ চলে যায় সাত নম্বর পাতায়। ব্যঙ্গবিদ্রূপে ভরা রচনাগুলি পড়তে পড়তে কখনও মনে মনে হাসি তো আবার কখনও হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা হয়ে যায়। কিন্তু মুশকিল হলো সুন্দর মৌলিকের সব লেখাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে। অথচ ভারতীয় রাজনীতিতে নির্মল হাসির খোরাক একা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোগান না। কাছাকাছির মধ্যে ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। আর দূরে গেলে তো চাঁদের হাট— অরবিন্দ কেজরিওয়াল, অখিলেশ যাদব, তেজস্বী যাদব, ইয়েচুরি। কিন্তু সুন্দর মৌলিক এদের দেখেও দেখেন না। যদি দেখতেন তা হলে লেখায় বৈচিত্র্য বাড়ত আর আমাদেরও পড়তে ভালো লাগত। একই কথা বলা চলে রাজ্যপাট কলামের লেখক নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও। নির্মাল্যবাবু অবশ্য সুন্দর মৌলিকের মতো রঙ্গরসিকতার ধার ধারেন না। ওঁর লেখা স্বভাবে ইন্টেলেকচুয়াল। কখনও কখনও ওঁর ভাষাবিন্যাস বেশ জটিলও। এমন একটা দুর্বোধ্য হেঁয়ালি লেখার মধ্যে ছড়িয়ে যে সময়বিশেষে মানে উদ্ধার করতে বেশ বেগ পেতে হয়। অনুরোধ, একটু সহজ করে লিখুন। আর বিজেপির নিন্দেমন্দ করার জন্য অনেক কাগজ আর ইলেকট্রনিক চ্যানেল ওত পেতে আছে। স্বস্তিকায় আপনি সেটা নাই-বা করলেন।

—দিলীপ রায়,
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধিতে অসুবিধা কোথায়?

অভিন্ন দেওয়ানি বিধির অর্থ সারা দেশের সকলের জন্য এক আইন, যা সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত বিষয়, যেমন বিবাহ, উত্তরাধিকার, দত্তক ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই লাগু হবে। সংবিধানের ৪৪নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সরকার সারা দেশের নাগরিকদের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি আইন লাগু করার প্রচেষ্টা করবে। ভারতীয়

সংবিধানের এই ৪৪ নম্বর ধারার উদ্দেশ্য হলো দুর্বল গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে বৈষম্য মোকাবিলা করা এবং এবং সারাদেশে যে অসংখ্য সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীসমূহ রয়েছে তাদের মধ্যে এক মেলবন্ধন গড়ে তোলা।

সংবিধানের ৪৪তম ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকার নাগরিকদের জন্য ইউসিসি প্রণয়নের চেষ্টা চালাবে। এই প্রতিবেদনটি সংবিধানের চতুর্থ খণ্ডের আওতায় পড়ে যা রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক বিধানগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত। এগুলি কোনও আদালতের দ্বারা কার্যকর করা সম্ভব নয়। তবে এতে বর্ণিত নীতিগুলি দেশের শাসন ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য এবং এই নীতিগুলিকে আইন প্রণয়নের কাজে লাগানো সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। নির্দেশমূলক নীতিগুলির সঙ্গে সংযুক্ত তাৎপর্যটি মিনার্ভা মিলস বনাম ভারত সরকারের মামলায় স্বীকৃত হয়েছিল, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে, মৌলিক অধিকারগুলিকে নির্দেশমূলক নীতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং এই সামঞ্জস্য সংবিধানের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তিগত আইন প্রথম ব্রিটিশ রাজের সময় প্রণীত হয়েছিল, প্রধানত হিন্দু ও মুসলমান নাগরিকদের জন্য। ব্রিটিশরা সম্প্রদায়ের নেতাদের বিরোধিতার আশঙ্কা করেছিল এবং এই গার্হস্থ্য ক্ষেত্রে আরও হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত ছিল। পূর্ববর্তী পর্তুগিজ গোয়া ও দমনে উপনিবেশিক শাসনের কারণে ভারতের গোয়া রাজ্য ব্রিটিশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, যেখানে গোয়া সিভিল কোড নামে পরিচিত একটি সাধারণ পারিবারিক আইন বজায় রাখা হয়েছিল। ভারতের স্বাধীনতার পর, হিন্দু কোড বিল প্রবর্তন করা হয়, যা ভারতীয় ধর্মের মধ্যে বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন ও শিখদের মধ্যে বিভিন্ন সংখ্যায় ব্যক্তিগত আইন সংশোধন ও সংস্কার করে এবং খ্রিস্টান, ইহুদি, মুসলমান ও পার্শিদের হিন্দুদের থেকে পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

ইউনিফর্ম সিভিল কোডের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের যে ধর্মীয় কুপ্রথাগুলি রয়েছে সেগুলি দূর হবে। প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মের দোহাই দিয়েই প্রচলিত রয়েছে কুপ্রথাগুলি। সেটা বাল্যবিবাহ, সতীদাহ হোক অথবা বহুবিবাহ, তিন তালাক। কিন্তু এক দেশ এক আইন হলে এই কুপ্রথামূলক ঘটনাগুলি ঘটবে না। আইনের নামে যে ধর্মীয় কুপ্রথাগুলি আজও প্রচলিত আছে তা থেকে মুক্তি দেওয়ার একমাত্র পথ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। ইউনিফর্ম সিভিল কোডের মাধ্যমে যদি এই কুপ্রথাগুলি দূরীভূত হয় তাহলে সমস্যা কোথায়? কেনই বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে এত বিরোধিতা, বিতর্ক!

অন্য সময় ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলে যারা মাতামাতি করেন, আজ সেই ধর্মনিরপেক্ষ দেশে যখন একই নিয়ম চালু হতে চলেছে, কেন তাঁরা বিরোধিতা করছেন! এক দেশে এক নিয়ম থাকবে, এটা হওয়াই তো উচিত। এরফলে যেমন কোনো সম্প্রদায়ই বিশেষ কোনো সুবিধা পাবে না, তেমনি ধর্মীয় কুপ্রথাগুলি, সেটা যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন দূর করা সম্ভব হবে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, ভারতবর্ষের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে যেখানে বহু ভাষা, বহু ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষজন বাস করেন, তাদের এক করার জন্য, একই সূত্রে বাঁধার জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি একান্তই প্রয়োজন। সম্প্রতি রাজ্যসভায় এই বিল পাশ হয়েছে এবং এর মধ্যে দিয়েই বাস্তবায়িত হোক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সেই বাণী, 'এক বিধান, এক প্রধান, এক নিশান'।

—দিগন্ত চক্রবর্তী,
মথুরাবাটি, সাতগড়া, জাঙ্গিপাড়া,
হুগলী।

রাজ্যপাট বিভাগে রাজ্যের সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠছে না

স্বস্তিকা পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র পত্রিকা যারা রাজ্য সরকারের দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের সমালোচনা করে। বাকি সবগুলো তৃণমূল সরকারের তোষণ করতে ব্যস্ত। সংবাদমাধ্যম সর্বদা পক্ষপাতহীন হওয়াই শ্রেয়। কারণ জনমত গঠনে সংবাদমাধ্যম চিরকালই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তাই সংবাদমাধ্যমকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়। সেদিক থেকে দেখলে স্বস্তিকা নিরপেক্ষভাবে সেই গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে। তবে কিছু লেখায় একটানা বিরোধিতা এবং একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনার দরুন বিভাগগুলো তার গুরুত্ব হারাচ্ছে বলে আমার ধারণা। যেমন রাজ্যপাট বিভাগে নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়ের লেখা প্রথম দিকে যেমন আকর্ষণ তৈরি করতো, একটানা মমতা বিরোধিতা করতে গিয়ে সেই লেখা তার জৌলুস হারাচ্ছে। লেবু বেশি কচলালে যেমন তেতো হয়ে যায়, নির্মাল্যবাবুর হালফিলের লেখাগুলোও অনেকটা তেমনি। নির্মাল্যবাবু যেন 'মমতা প্রসঙ্গ' থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছেন না। নির্মাল্যবাবু সোজাসাপটা কথা বলতে ভালোবাসেন। এটা বড়োগুণ বটে। নির্মাল্যবাবুর স্বস্তিকায় লেখা কিছু প্রতিবেদন রাজ্যনীতিতে তোলপাড় ফেলেছে। বড়ো বড়ো নিউজ চ্যানেলে তা নিয়ে বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। খুব ভালো কথা। কিন্তু এখন যেন লেখাগুলো বড্ড একঘেঁয়ে লাগছে। মোট কথা, রাজ্যের মানুষের কথা তাতে নেই। রাজ্যের সামগ্রিক চিত্র তাতে ফুটে উঠছে না।

শুনেছি নির্মাল্যবাবু বড়ো সাংবাদিক। মাঝেমাঝে কয়েকটি চ্যানেলে ওনাকে অংশ নিতেও দেখেছি। এ রাজ্যের বহু বিষয় আছে। যেগুলো নিয়ে তেমন কাউকে আলোকপাত করতে দেখি না। নির্মাল্যবাবু সাধারণ মানুষের সেইসব সমস্যা নিয়ে একটু লিখতে পারেন। রাজনীতি প্রাত্যহিক জীবনে প্রাসঙ্গিক। যতক্ষণ না তা কচকচানির পর্যায়ে যাচ্ছে। একইভাবে সুন্দর মৌলিকের চিঠিতেও সবকটিই মাননীয়া দিদিকে সম্বোধন করে লেখা। নেগেটিভ প্রচার থেকেও মানুষ ফায়দা তুলে নেয়, এটা মনে রাখা উচিত। স্বস্তিকার সম্পাদক মণ্ডলীকে অনুরোধ করব বিষয়টির দিকে নজর দিতে।

—শোভন দাস,
চড়িদা, বাঘমুণ্ডি,
পুরুলিয়া।

নারী শক্তির আরও এক নাম মাহসা আমিনি

দিতি ভট্টাচার্য্য

ভারতের মুসলমান সমাজ যখন আজও মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থায় মুসলমান মহিলাদের পর্দার আড়ালে রাখতে ব্যস্ত, তখন মধ্যপ্রাচ্যের মোল্লাতান্ত্রিক ইরানে অন্দরের ঘেরাটোপ ভেঙে পথে নামল মেয়েরা। মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্তাল ইরান। বাতাসে উড়ছে হিজাব। আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেই কাপড়ের টুকরো। প্রকাশ্যে চুলের মুঠি ধরে নিজেরাই কেটে ফেলছেন নিজেদের চুল। তাঁদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসছেন পুরুষরাও। সেই চুল কাটার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টও করেছেন তাঁরা।

ইরানে যে হিজাব পরা বাধ্যতামূলক সেই হিজাব তাঁরা উড়িয়েছেন আকাশে। পুড়িয়েছেন আগুনে। জ্বলেছে ইরান। বিক্ষোভ-প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন ইরানের কাতারে কাতারে পুরুষ-নারী। প্রেসিডেন্টের ফরমানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সরকার বিরোধী প্রতিবাদ মিছিলে পা মিলিয়েছেন তাঁরা। হিজাব ত্যাগের ডাক দিয়েছেন তাঁরা। আর এই চলতি প্রতিবাদ-বিক্ষোভ নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য না করায় বিক্ষোভকারীরা ইরানের ধর্মীয় নেতা খোমেইনির মূর্তিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। ইরানের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে শুরু হয়ে গোটা দেশেই তা ছড়িয়ে পড়ে। আর যথারীতি ইরান সরকার তা দমনের জন্য নিজের স্বৈরাচারী রূপ প্রকাশ্যে আনে।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি তার পরিবারের সঙ্গে তেহরানে ভ্রমণ করছিলেন এবং হিজাব পরিধানের সরকারি নিয়ম (ইরানের কঠোর পর্দাবিধি) লঙ্ঘন করার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে যখন পুলিশ হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তার ভাই বলেছিলেন যে তিনি তার বোনকে চিৎকার করতে শুনেছেন। কারণ তাকে পুলিশ মারধর করেছে। তার ভাই আরও বলেন যে যখন তাকে কাসরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন তিনি তার বোনের মাথায় ও পায়ে ক্ষত লক্ষ্য করেছিলেন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসকরা জানান, কান থেকে রক্তক্ষরণ ও চোখের নীচে ক্ষত-সহ মস্তিষ্কে আঘাত পাওয়ায় তার ব্রেন ডেড। তিনি তিন দিন কোমায় থাকার পর ১৬ সেপ্টেম্বর মারা যান।

তিনি মাহসা আমিনি। তারা কুর্দি সম্প্রদায়ের ইসলাম মতাবলম্বী মানুষ। ২২ বছরের মাহসা আমিনির পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর পর থেকেই শুরু হয়েছিল বিক্ষোভ প্রতিবাদ। ক্রমেই সেই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা দেশে। অসংখ্য মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে ইরানের মানবাধিকার সংগঠন। ইরান হিউম্যান রাইটসের দাবি, স্কুল ও রাস্তায় প্রতিবাদ করা বহু ছাত্রীকে গ্রেপ্তার করে ইরানের নিরাপত্তা বাহিনী। তারা জানায় উত্তর ইরনের কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারেও প্রতিবাদ হয়। প্রতিবাদের সময় সেখানে আর ৬ জন নিরাপত্তা রক্ষীবাহিনীর গুলিতে নিহত হন। আরও উত্তাল হয় ইরানের পরিস্থিতি।

কখনও হিজাব উড়িয়ে দিয়ে আবার কখনও হিজাব পুড়িয়ে সেখানে প্রতিবাদ করেছেন মহিলারা। ছাত্রীরাও স্কুলে হিজাব পরছিলেন না। স্কুলগামী মেয়েরা মেয়েরা তাদের হিজাব খুলে সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছিল। স্কুলের ভেতরের মাঠে ও কয়েকটি শহরের রাস্তায় স্কুলশিক্ষার্থীদের এভাবে প্রতিবাদ জানানোর ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে। এমনকী বিশ্বকাপের ইরানি খেলোয়াড়রাও এই আন্দোলনকে সমর্থন করে সরাসরি মাঠ থেকেই সারা বিশ্বকে বার্তা দেয়। অবশেষে ইরানে প্রতিবাদী নারীদের বিজয় হয়। বাধ্যতামূলক হিজাব পরা আইনের বিরুদ্ধে চলা রক্তক্ষয়ী বিক্ষোভের পর 'নীতি পুলিশ ব্যবস্থা' বিলুপ্ত করার কথা জানান দেশটির অ্যাটর্নি জেনারেল মোহম্মদ জাফর মোনতেজারি।

আমিনির মৃত্যুর পরে ফোর্বসের বিশ্বের ১০০ জন ক্ষমতাধর নারীর তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। আন্দোলনটি সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পায়। আমিনির নামটি শুধুমাত্র মোল্লাতান্ত্রিক সরকারের নাগরিকদের উপর দমনপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়ে ওঠেনি, এটি একটি হ্যাশট্যাগেও রূপান্তরিত হয় যা ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ৭ কোটি ৯০ লক্ষ বার ব্যবহার করা হয়। 'মাহসা আমিনি এখন নারী স্বাধীনতার একটি বৈশ্বিক প্রতীক, শুধু ইরানেই নয়, ' বলেছেন নিনা আনসারী, একজন ইতিহাসবিদ এবং নারী অধিকার কর্মী। মাহসার বাবা তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ইসলামিক প্রার্থনা করতে অস্বীকার করেছিলেন।

অভিনন্দন জানাতেই হবে ইরানের জনগণকে আর শ্রদ্ধা জানাই মাহসা আমিনী-সহ প্রতিবাদী ইরানিদের। ইরান সরকারের বিরুদ্ধে এই জয় নারীশক্তির উত্থান ও বিজয় হিসেবেই বিবেচিত হবে। ভারতের সেকুলার পন্থীরা হিজাব পরার পক্ষে সওয়াল করে। একদিকে তারা নারী স্বাধীনতার বুলি আওড়ায়, অন্যদিকে শরিয়া আইনকে সমর্থন করে। ইরানের মেয়েদের মরণপণ এই আন্দোলন থেকে এদেশের সিউডো-সেকুলারিস্টদের জ্ঞানচক্ষু খুলবে কি? □

শীতকালে শিশুদের বেশি খেয়াল রাখতে হবে

ত্রিয়া সিংহ

শীতকাল কম-বেশি আমাদের সকলেরই খুবই প্রিয়। এইসময় চারিদিকে এক উৎসবের আবহাওয়া লক্ষ্য করা যায়। চড়ুইভাতি হোক বা কোথাও ভ্রমণ, শীতকাল হলো তার উপযুক্ত সময়। তবে এই ঋতু পরিবর্তনের ওপর আমাদের শরীর-স্বাস্থ্যের বরাবরই একটি প্রভাব থাকে। বিশেষত শীতের হিমেল হাওয়া শিশুদের অনেকটাই কাবু করে দেয়। বাইরের এই পরিবর্তিত আবহাওয়াতে শিশু যাতে দ্রুত অসুস্থ হয়ে না পড়ে, সেই জন্য শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

এই সময় সাধারণ যে উপসর্গগুলি দেখা যায় সেগুলি হলো— ঠাণ্ডা লাগা, ফ্লু, অ্যালার্জি, গলা ব্যথা, গলা খুস খুস, হাঁচি, কাশি ইত্যাদি। এই সমস্ত উপসর্গ থেকে রক্ষা পেতে দেহের ইমিউনিটি পাওয়ার বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে হবে। এই ইমিউনিটি পাওয়ার বৃদ্ধিতে খাদ্যের এক বিশেষ ভূমিকা আছে।

প্রকৃতিগত ভাবেই অন্যান্য ঋতুর তুলনায় শীতকালে শাকসবজির বৈচিত্র্য তুলনামূলকভাবে বেশি। ভিন্ন ভিন্ন রঙিন শাকসবজিতে আলাদা আলাদা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এছাড়াও থাকে অ্যান্টি- ইনফ্লেমেটারি উপাদান। শীতকালীন শাকসবজি ও ফলের স্বাদ ও পুষ্টিগুণ বেশি মত্রায় থাকে। এগুলি আমাদের দেহের ভিটমিন ও খনিজ লবণের অন্যতম উৎকৃষ্ট উৎস। তাই মরসুমি শাকসবজি ও ফল শিশু ও স্কুলপড়ুয়া বালক-বালিকাদের খাদ্য তালিকায় অবশ্যই রাখতে হবে।

বেশিরভাগ শিশুই সবজি খেতে পছন্দ করে না। তাই বিভিন্ন রকমের আকর্ষণীয় পদ বানিয়ে তাদের কাছে এটি গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। কিছু শাক আছে যা শরীরকে উষ্ণ রাখতে সাহায্য করে, যার মধ্যে অন্যতম হলো পালংশাক ও মেথিশাক। বাচ্চাদের প্রাতরাশ হিসেবে পালং বা মেথির পরোটা বা লুচি দেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও রয়েছে সরষেশাক, যা গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করা যেতে পারে।

শীতের বাজারে বেশি দেখা যায় ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলো, শিম, টম্যাটো, ব্রকলি, গাজর, ধনেপাতা, বিন, মটরশুটি ইত্যাদি। এই সব সবজিতে রয়েছে বিটা ক্যারোটিন পটাশিয়াম, ফলিক অ্যাসিড, বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ফাইটোকেমিক্যালস। এই ধরনের শাকসবজি দিয়ে খিচুড়ি বানিয়ে খাওয়ালে শিশুদের জন্য তা অত্যন্ত উপকারী। আবার এই সমস্ত শাকসবজির সঙ্গে মাছ অথবা মাংসের ছোটো ছোটো টুকরো সংযোগ করে স্যুপ বানিয়ে খাওয়ালে তা আরও উপকারী। সমস্ত রকমের শাকসবজির সঙ্গে মাছ অথবা মাংসের ছোটো ছোটো টুকরোর সঙ্গে করে স্যুপ বানিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে। এই ধরনের খাদ্য শুধুমাত্র শরীরকে উষ্ণ রাখে তাই নয়, এর পাশাপাশি ত্বকের সজীবতা ধরে রাখে।

রোগ প্রতিরোধক হিসেবে রসুনের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। শিশুদের খাবারে অতি অবশ্যই রসুন রাখতে হবে।

শীতকালে বাচ্চাদের জন্য একটি সুস্বাদু পদ হলো গাজরের হালুয়া। গাজর রক্তের WBC ও Boosting-এর সাহায্য করে, যা দেহের ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ায় এবং বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করে।

শীতের আরেকটি অন্যতম খাদ্য হলো মিষ্টি আলু বা রাঙালু। এটি তাৎক্ষণিক শক্তি বৃদ্ধিকারী এবং দেহ উষ্ণ রাখতে সাহায্য করে। স্বাদে মিষ্টি হওয়ার দরুন শিশুরা সহজেই খেয়ে নেয়।

শীতকালীন ফল বিশেষত কমলালেবু শিশু ও বালক-বালিকাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় গোটা ফল অথবা ফলের রস হিসেবে অবশ্যই রাখা উচিত। কমলালেবু ভিটামিন সি সমৃদ্ধ, যা দেহের ইমিউনিটি সিস্টেমকে শক্তিশালী করে। এছাড়া ত্বকের মধ্যে থাকা ইমপিউরিটিজ দূর করে এবং ত্বকের স্বাস্থ্য বজায় রাখে। অন্যান্য সাইট্রাস ফল যেমন— আমলকি, পেয়ারা, লেবু, নাসপাতি ইত্যাদিও খাদ্য তালিকায় রাখা যেতে পারে।

এছাড়াও শীতকালে শিশুদের শরীর গরম রাখতে পর্যাপ্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার পথ্যে রাখতে হবে। যেমন বাদামের হালুয়া অথবা বেসন হালুয়া— যা উন্নতমানের পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ ও সুস্বাদু তা শিশুদের বিকেলের টিফিন হিসেবে দেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও প্রাণীজ প্রোটিন হিসেবে ডিমের ভূমিকা অন্যতম। প্রতিদিন একটি করে ডিম শিশুকে খাওয়ানো যেতে পারে, এটি শক্তিবর্ধক হিসেবে ও শরীরকে উষ্ণ রাখতে সাহায্য করে।

মধু প্রকৃতিগত ভাবেই রোগজীবাণু প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। প্রতিদিন সকালে শিশুকে এক চামচ মধু খাওয়ালে সর্দি-কাশি-সহ শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত সমস্যা, গলাব্যাথা, খুসখুসে কাশি ইত্যাদিতে উপকার পাওয়া যায়। ঠিক একই প্রকার গুড় হলো শীতের আর একটি উপকারী খাদ্য। চিনির বদলে শিশুর খাদ্যে গুড় সংযোজন করা উচিত। এটি সাধারণ ঠাণ্ডা লাগা থেকে শরীরকে রক্ষা করে।

শিশুরা যদি সর্দি কাশিতে ভোগে তাহলে কিছুটা কাঁচা হলুদ গরম দুধে মিশিয়ে খাওয়ালে খুব উপকার পাওয়া যায়। হলুদ দুধ হলো অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটারি এবং দেহে ইমিউনিটি তৈরিতেও সাহায্য করে।

তবে শিশুদের জলপান করার বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন। শীতকালে স্বাভাবিকভাবেই তৃষ্ণা কম থাকে, তাই একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে জল পান করাতে হবে। যাতে করে শরীরে জলের ঘাটতি না ঘটে। এই সময় ঠাণ্ডা জলের বদলে ইষদুষ্ণ জল পান করালে ঠাণ্ডা লাগা সহজেই এড়ানো সম্ভব।

(লেখক বিশিষ্ট পুষ্টিবিদ)

শ্বাসকষ্ট হলে নিজে ডাক্তারি করবেন না

স্বপন দাস

সারা পৃথিবীতে কম-বেশি হলেও অনেক মানুষ শীতকালে শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যায় ভোগেন। এর কারণ হিসেবে চিকিৎসকদের মতে বায়ুতে দুষণ, আর্দ্রতার হেরফের, আর কিছু বিশেষ ধরনের জীবাণুর সক্রিয় হয়ে ওঠাই এই সমস্যার প্রধান কারণ। তাঁরা ফুসফুসে সংক্রমণ ও শ্বাসকষ্ট জনিত বিষয়ে একেবারে প্রথমেই রেখেছেন বায়ু দূষণকে।

বায়ুদূষণকে শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণের একটা প্রধান কারণ হিসেবে বলতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন, বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ সাধারণ ভাবে যা হওয়া দরকার, তা যদি কোনো কারণে কমে যায়, তাহলে বায়ুর অন্য সব উপাদানের ভারসাম্য অনেকটা টালমাটাল হয়ে পড়ে। এটাকে তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে, বায়ুতে অক্সিজেন থাকার কথা ২১ শতাংশের মতো। এই অক্সিজেনের মাত্রা যদি কমে, অর্থাৎ কোনো কারণে যদি এই ঘাটতি ঘটে আর সেই কারণের ফলে অন্য গ্যাসের ঘনত্ব বা ধূলিকণার পরিমাণ বায়ুতে বেড়ে যায়, তবেই তাকে আমরা বায়ুর দূষণ হয়েছে বলে থাকি।

দূষিত বায়ু গ্রহণের ফলে অনেকেই ফুসফুসের নানা রোগে আক্রান্ত হন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ফুসফুসের ক্যানসারে মৃত্যুর ৫ শতাংশ বায়ুদূষণের সঙ্গে সম্পর্কিত। এছাড়া বায়ুদূষণ হাঁপানি (অ্যাজমা) রোগ বৃদ্ধি করে। বাতাসে ভেসে থাকা ধূলিকণা ফুসফুসে জমা হয়ে জটিল রোগ তৈরি করে। পাশাপাশি এতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে থাকে। আর এই বায়ুদূষণের কারণে বিনা বাধায় দূষিত এলাকার মানুষ জীবাণুর আক্রমণে ধীরে ধীরে জর্জরিত হয়ে পড়েন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে আমাদের শহরে বা গ্রামের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার পরিবেশে জীবাণুর সংক্রমণ যেমন বেশি হবার সম্ভাবনা, তেমনি পরিবেশ দূষণের মাত্রাটাও অনেক বেশি।

একদিকে যেমন বায়ুদূষণকে চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা দায়ী করছেন তেমনি যারা ধূমপান করেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও ফুসফুসের সংক্রমণ জনিত সমস্যা দেখা দেবার সম্ভাবনাকে এগিয়ে রেখেছেন কারণ হিসেবে। তাঁরা এই মত প্রকাশ করেছেন যে ফুসফুসের যে অসুখবিসুখের সম্ভাবনা একজন ধূমপান করা ব্যক্তির চেয়ে ধূমপান না করা ব্যক্তির কম। ফুসফুসের ক্যানসারের কারণ হিসেবে তাঁরা একেবারে প্রথম সারিতে রেখেছেন এই ধূমপানকে। তাঁরা এও বলেছেন যে, ফুসফুসের ক্যানসারে যারা চিরতরে হারিয়ে যান, তাঁদের মধ্যে ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশের ক্যানসারের কারণ এই ধূমপান।

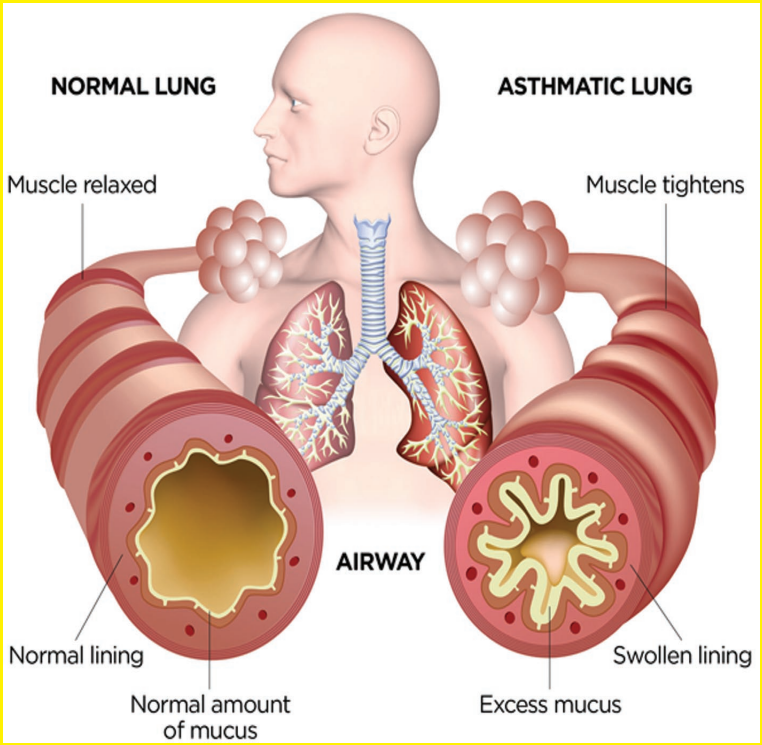

ফুসফুসের সংক্রমণ থেকে বাঁচতে :

১। বাইরে বেরোবার সময়ে যাতে ঠাণ্ডা না লাগে, তাঁর জন্য গরম জামাকাপড়ে শরীর ঢাকুন।

২। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি করোনাকালের পুরোনো অভ্যাস ছাড়বেন না। মাস্ক পরুন আর নাকে বা মুখে হাত দেবার সময় ভালো করে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে নিন।

৩। ঠাণ্ডা গরমের সমতা রাখার জন্য শারীরিক কসরত একটু কম করুন।

৪। প্রচুর জল খান। শাক ও সবজি খান বেশি করে। যা আপনার ফুসফুসকে সতেজ রাখতে সাহায্য করবে।

৫। যাদের নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়। তাঁরা ওষুধ খাওয়া বন্ধ করবেন না।

সব শেষে আবারও বল দরকার, নিজের ডাক্তারি নিজে নয়, চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াটা জরুরি।

অ্যালার্জির কারণগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে

প্রফেসর ডাঃ আর. এন. দাস
(ইন্টারনাল মেডিসিন সিনিয়র কনসালট্যান্ট)

অ্যালার্জি হলো একধরনের হাইপার সেন্সিটিভ রিঅ্যাকশন টাইপ-১। ফুলের রেণু থেকে অনেকের অ্যালার্জি হয়। ডিম, বেগুন, চিংড়ি খেলে অনেকের গায়ে চাকা চাকা দাগ হয়। এগুলো যেমন একধরনের অ্যালার্জি,

ঠিক তেমনি অ্যাস্থমা বা হাঁপানি হলো আরেক ধরনের অ্যালার্জি। এটা ফুসফুসে হয়। অ্যাস্থমা হলো টাইপ-১ আইজিই মিডিয়েটেড অ্যালার্জি। কিছু ক্ষতিকারক বস্তুর সংস্পর্শে এলে শরীরের ইমিউন সিস্টেম সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দিতে শুরু করে। কারও হাঁচি হয়, কারও নাক দিয়ে কাঁচা সর্দি বেরোতে থাকে। শ্বাসনালী ফুলে গিয়ে সংকুচিত হতে থাকে। ফলে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। এটাই অ্যাস্থমা। অনেকে কানে নিকেলের গয়না পরেন, অন্তর্বাসে নিকেলের যে হুক থাকে অনেকের তা থেকে অ্যালার্জি হয়। সেই অ্যালার্জি থেকে শ্বাসকষ্ট হয়। সাধারণত ৫ থেকে ১৫ বছর বয়সিদের মধ্যে অ্যাস্থমার প্রবণতা দেখা দেয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করালে অনেকক্ষেত্রে এর মারাত্মক প্রভাব কমে আসে। যা খেলে অ্যালার্জি হয় বা যেগুলোর সংস্পর্শে এলে অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন হয় সেগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। যাদের মধ্যে নিয়মিত অ্যালার্জির লক্ষণ দেখা যায়, তাদের ক্ষেত্রে প্রিক টেস্ট, রিস্ক অ্যান্ড রাস্ট টেস্ট বা রেডিও ইমিউনো অ্যালার্জেন টেস্টগুলো করিয়ে নেওয়া দরকার।

অ্যাস্থমা তিন ধরনের হয়। কার্ডিয়াক অ্যাস্থমা, যা থেকে শ্বাসকষ্ট হয়, রেনাল অ্যাস্থমা, কারও কিডনি ফেলিওর হলে তার জন্যও শ্বাসকষ্ট হয়। আর ব্রঙ্কিওল অ্যাস্থমা। ফুসফুসের সংক্রমণ থেকে এই অ্যাস্থমা হয়। শীতকালে ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হয়, ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়। অনেকের ক্ষেত্রে এটা প্রতিবছর হতে থাকে। অর্থাৎ শীতকাল এলেই সর্দি,কাশি, হাঁচি লেগেই থাকে। সেক্ষেত্রে নানারকম প্রতিরোধক ভ্যাকসিন আছে। শীত পড়ার আগে এই ভ্যাকসিনগুলো নেওয়া থাকলে অসুস্থতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

শীত পড়ার আগে থেকেই সতর্ক থাকলে সর্দিকাশি এড়ানো যায়

ডা. জয়দেব কুন্ডু (হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক)

শীতের শুরুতেই অনেকের ঠাণ্ডা লেগে সর্দিকাশি হয়। কারও ক্ষেত্রে অল্প শ্বাসকষ্টের সমস্যাও থাকে। সেক্ষেত্রে বেশকিছু স্পেসিফিক হোমিওপ্যাথি ওষুধ আছে, যেগুলো দিয়ে রোগীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান করা যায়। হোমিওপ্যাথি ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খুব একটা হয় না। তাই বহু মানুষই এই চিকিৎসা নিতে পছন্দ করেন। তবে ওষুধ দিয়ে শুধুমাত্র সেই সময়ের মতো রোগীকে কষ্টের হাত থেকে রেহাই দিলেই কাজ শেষ হয়ে যায় না। জানতে হবে রোগটা কেন হচ্ছে, তার উৎস কী? তার জন্য রোগীর পাস্ট হিস্ট্রি নিতে হবে। অনেকেই ছোট থেকে সর্দিকাশিতে ভোগেন। নাক বন্ধ হয়ে গিয়ে শ্বাসকষ্ট হয়। তখনকার মতো চিকিৎসা করিয়ে আর ডাক্তারের কাছে যান না। এর ফলে গোড়া থেকে

রোগ নির্মূল হয় না। বারবার ফিরে আসে। রোগটা তখন সিজনাল হয়ে দাঁড়ায়। এর সঙ্গে রোগীর খাদ্যাভ্যাস জড়িয়ে থাকে। এইসময় ঠাণ্ডা লাগানো যাবে না। যাদের ঠাণ্ডা লাগার ধাত আছে তাদের সবসময় গরম কাপড় দিয়ে কান, গলা ঢেকে রাখা উচিত। যাদের অ্যাস্থমা আছে, তারা মাস্ক পরুন। বিশেষ করে ঋতু পরিবর্তনের সময়ে এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে। রোগ হলে তার চিকিৎসা আছে। ওষুধ খেলে সেরে যাবে। তার চেয়ে ভালো যাতে রোগটা না হয় সেদিকে নজর দেওয়া। মনে রাখতে হবে 'প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর'।

শীতকালীন ফুসফুসের সংক্রমণ

ডা. সুশোভন পাল (আয়ুর্বেদ চিকিৎসক)

শীতকালীন ফুসফুসের সংক্রমণ ব্যাধি আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় সম্ভব। শীতকালে সাধারণত বায়ু ও কফের প্রকোপ বাড়ে। শ্বাসনালী বায়ু ও কফ দ্বারা আবৃত হয়ে পড়ে, যা থেকে শ্বাস সংক্রান্ত সমস্যার সূত্রপাত হয়। এইসময় উষ্ণবীর্য জাতীয় দ্রব্য যেমন পিপ্পলি, ত্রিকটু ইত্যাদি সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়। যা শরীরের উষ্ণতাও বাড়ায় এবং একইসঙ্গে বিপাকশক্তিও বৃদ্ধি করে। ফুসফুস সংক্রামিত হলে শিতপলাদী, তালিশাদী, অগস্ত্যহরিতকী, শ্বাসকাশচিন্তামণি রস ইত্যাদি ওষুধ আয়ুর্বেদাচার্যের পরামর্শ মেনে খাওয়া উচিত।

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হাঁপানি রোগ নিরাময়ের জন্য সরষের তেল মাখিয়ে রোদে কিছুক্ষণ রেখে দিলে উপকার পাওয়া যায়। তেলের মধ্যে কালোজিরে, পিপ্পলি মিশিয়ে গরম করে সর্বাঙ্গবেদ করালে আরও ভালো। এছাড়াও উত্তুরে হাওয়া, পুরোবায়ু এসব থেকে শিশুকে রক্ষা করতে হবে। ওষুধ হিসেবে তুলসীপাতার রস, মধু বা পিপ্পলি, মিছরি ও বাসক পাতার রসের মিশ্রণ খুব উপকারী, সেই সঙ্গে শরীর গরম রাখে। তাছাড়াও ওষুধ হিসেবে বালচতুঃভদ্রিকা, লক্ষ্মীবিলাস, চিত্রকহরিতকী, তালিশাদী ইত্যাদি চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ব্যবহার করলে রোগের উপশম হয়।

বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সুশান্ত মিত্র বলেন, 'শীতকালে আমাদের একদিকে যেমন শ্বাসকষ্ট জনিত একটি সমস্যা দেখা দেয়। তেমনি দেখা দিতে পারে ফুসফুস ও শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা। এর কারণ আমাদের আবহাওয়ার একটা পরিবর্তন।

শীতকালে আমাদের চারপাশের বাতাস ও আবহাওয়ার তাপমাত্রা কমে যায় অনেকটাই। আর বাড়ে আর্দ্রতা। বাতাসে আসে একটা শুষ্ক ভাব। এই শুষ্ক ভাবের কারণে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের যে প্রক্রিয়া সেখানে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। গলায় যেমন একটা সংক্রমণ জনিত অস্বস্তি দেখা দেয়, অন্যদিকে এটা শ্বাসযন্ত্রের স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটায়। এটা হয় দূষণ, ধূমপান ও বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা থেকে। এই সময়ে বাতাসের মধ্যে ধূলিকণা বেশি করে সৃষ্টি হয়।

সাধারণ শ্বাসনালীর সমস্যার সঙ্গে দেখা দিতে পারে নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, সিওপিডি। এগুলির নেপথ্যে রয়েছে কিছু ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাস। যেগুলি ফুসফুসকে আঘাত করে। এই সমস্যা দেখা দেয় একেবারে শিশুদের ও বৃদ্ধদের। যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। জ্বর, গা ব্যাথা, বুকে কফ জমে যাওয়া উপসর্গ দেখা দেয়। আর এই সব উপসর্গ দেখা দিলেই নিজের ডাক্তারি নিজে না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াটা খুবই জরুরি।'

বিশ্ব হাঁপানি দিবস

বিশ্বজুড়ে অ্যাস্থমা বা হাঁপানি নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশে মে মাসের কোনো একটি দিনে 'ওয়ার্ল্ড অ্যাস্থমা ডে' বা 'বিশ্ব হাঁপানি দিবস' পালন করা হয়। প্রতিবছর এই দিনটিতে গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ ফর অ্যাস্থমা (জিআইএনএ)-র পরিচালনায় সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়। উদ্বোধনী বিশ্ব হাঁপানি দিবস অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৮ সালে। ২০১২ সালে বিশেষ পর্বের অনুষ্ঠানের থিম ছিল 'আপনি আপনার হাঁপানি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।'

হাঁপানি থেকে রেহাই পেতে কিছু ঘরোয়া টোটকা

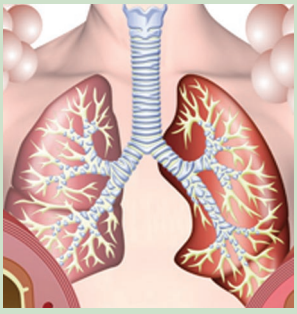

আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে বছরের যেকোনও সময়েই হাঁপানির সমস্যা বাড়তে পারে। তবে সাধারণত এর প্রকোপ বেশি হয় শীতকালে। এই রোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বংশগত। ইদানীংকালে মাত্রাতিরিক্ত দূষণের ফলে অনেকের মধ্যেই হাঁপানির সমস্যা দেখা যাচ্ছে। নানাধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির পাশাপাশি অনেকক্ষেত্রে ঘরোয়া টোটকাতেও এ রোগের উপশম হয়। তেমনি কিছু কার্যকরী ঘরোয়া টোটকার উল্লেখ করা হলো—

১) জলের মধ্যে একটুকরো আদা ফেলে ফুটিয়ে নিন। মিশ্রণটি সামান্য ঠাণ্ডা করে খেয়ে নিন। শুধু হাঁপানি নয়, সর্দিকাশিতেও আদার রস খুব উপকারী।

২) এক কাপ দুধের মধ্যে চার কোয়া রসুন ফেলে ফুটিয়ে নিন। তারপর ঠাণ্ডা করে ওই রসুন দুধের মিশ্রণ খেয়ে নিন। ফুসফুসের যেকোনও রোগে এই টোটকা খুব কার্যকরী।

৩) হাঁপানির সমস্যা নিরাময়ের ক্ষেত্রে অন্যতম সেরা টোটকা হলো মধু। বিশেষজ্ঞদের মতে, রোজ রাতে ঘুমোতে যাবার আগে এক চামচ মধুর সঙ্গে সামান্য দারুচিনির গুঁড়ো মিশিয়ে খেলে শ্বাসকষ্ট অনেকটাই কমে। সর্দিকাশিতেও এই টোটকা ফলদায়ী।

৪) ল্যাভেন্ডার তেল হাঁপানির উপশমে খুব কার্যকরী। এক কাপ গরম জলে ৫-৬ ফোঁটা ল্যাভেন্ডার তেল ফেলে ধীরে ধীরে ভাপ নিলে শ্বাসকষ্টের দ্রুত উপশম হয়।

৫) পাতিলেবুর রসে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন-সি এবং অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট পাওয়া যায়। এক গ্লাস জলের মধ্যে পাতিলেবুর রস আর সামান্য চিনি দিয়ে রোজ খেতে পারলে হাঁপানির কষ্ট অনেকটাই কমে।

৬) শ্বাসকষ্ট দূর করতে নিয়মিত কাঁচা পেঁয়াজ খেতে পারেন। বলা হয়, পেঁয়াজ নাসাপথ পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।

৭) হাঁপানিতে হরিদ্রা বা হলুদ খুবই উপকারী। কাঁচা হলুদ নিয়মিত খেলে শ্বাসকষ্টের তীব্রতা কমে।

৮) তুলসীপাতার রস, শিউলিপাতার রস এবং শিউলি পাতার ফুল সমান উপকারী।

উল্লিখিত উপায়গুলি চিকিৎসাশাস্ত্রে পরীক্ষিত না হলেও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ঘরোয়া টোটকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই টোটকাগুলি সাময়িকভাবে সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে। এর পাশাপাশি চিকিৎসকের পরামর্শও অত্যন্ত জরুরি।

ইনহেলার ব্যবহারের খুঁটিনাটি

হাঁপানির শ্বাসকষ্ট থেকে রেহাই পেতে চিকিৎসকরা অনেককেই ইনহেলার প্রেসক্রাইব করেন। এই ইনহেলার ব্যবহারের ক্ষেত্রে রয়েছে বেশ কয়েকটি পদ্ধতি। সঠিকভাবে পদ্ধতি মেনে ইনহেলার ব্যবহার করতে হবে—

১) ব্যবহারের আগে ইনহেলারটিকে ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন। ইনহেলার ব্যবহারের জন্য আশেপাশের আবহাওয়া বা বাতাস ঠিক থাকলে এবার মুখে স্প্রে করুন। ওষুধসহ শ্বাস টেনে নিন। ৬-১০ সেকেন্ড নিঃশ্বাস বন্ধ রাখুন।

২) মুখের দেড় থেকে দু ইঞ্চি দূরত্বে ইনহেলার রাখুন। মাথা খানিকটা পিছনে হেলিয়ে দিয়ে বুকের বাতাস আগে প্রশ্বাসের মাধ্যমে বের করার চেষ্টা করুন। বাতাস বের হলে মুখে ইনহেলার চেপে ওষুধ নেবার চেষ্টা করতে হবে। ওষুধ গিলে ফেলবেন না একেবারেই। তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ড ধরে ভিতরে টেনে নিন। এরপর ১০ সেকেন্ড পর্যন্ত মুখ বন্ধ করে রাখুন।

৩) ইনহেলার নেবার পর ভালো করে মুখ কুলকুচি করে নিতে হবে। নয়তো জিভে বা মুখে ছত্রাক সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। রাতে শোওয়ার আগে ইনহেলার নিলে ভালো করে ব্রাস করে নেওয়া উচিত।

৪) ব্যবহৃত ইনহেলার প্রতিদিন পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত জরুরি। মাউথপিসটি গরম জলে ধুয়ে নিন। তারপর শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর ক্যানিস্টার লাগানোর আগে দেখে নিতে হবে মাউথপিসে যেন জল লেগে না থাকে।

৫) খুব উষ্ণ বা আর্দ্র জায়গায় ইনহেলার রাখবেন না। বাথরুম বা রান্নাঘরে একেবারে ইনহেলার রাখবেন না। অপেক্ষাকৃত শীতল ও শুষ্ক, পরিষ্কার জায়গায় ইনহেলার রাখুন।

৬) হঠাৎ শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রে একটি রেসকিউ ইনহেলার সবসময় সঙ্গে রাখুন। এটি ব্যবহার করলে ধীরে ধীরে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়।শুধুমাত্র আপৎকালের নিরিখে এই ইনহেলার ব্যবহৃত হয়।

সময়োচিত সুচিকিৎসায় হাঁপানি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব

ডা. উচ্ছল ভদ্র

শীতকালে ঠাণ্ডা হাওয়ার নিঃশ্বাস হাঁপানির পক্ষে ভালো নয়। বেশিরভাগ সময় বাড়ির ভেতর থাকলে ভালো হয়। বাইরে বেরুলে নাক-মুখ স্কার্ফ দিয়ে ঢাকা থাকলে নিঃশ্বাসের হাওয়ার ঠাণ্ডা ভাবটা একটু কমে। ঠাণ্ডা জল, শরবত, কোল্ড ড্রিংকস, আইসক্রিম এসব একদমই ছোঁয়া যাবে না। শ্বাসকষ্ট শুরু হচ্ছে মনে হলেই এলবিউটেরল জাতীয় নিমেষে কাজ করতে পারে এমন ইনহেলার ব্যবহার করা উচিত। ইনহেলার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে। ওষুধের পুরোটাই ভালোভাবে ফুসফুসে ঢুকছে কিনা সেদিকে নজর রাখতে হবে। বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত জরুরি। শিশুদের জন্য নেবুলাইজার বা স্পেসার ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে হাঁপানির উৎস কিন্তু অ্যালার্জি, যা সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না। তবে সময়োচিত সুচিকিৎসায় সেটা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো চলে আমার হাঁপানি এখন নিয়ন্ত্রণে

মন্টু দাস

৩০ বছর বয়সে আমার হাঁপানি ধরা পড়ে। তার বছর খানেক আগে থেকে আমার একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে যেত। প্রায়ই সর্দিকাশি হতো। তারপর অল্প শ্বাসকষ্ট হতে থাকে ডাক্তারবাবুকে দেখাতেই বললেন টেস্ট করাতে। রিপোর্টে অ্যাস্থমা ধরা পড়লো। তারপর থেকেই ইনহেলার নিই। সাধারণত দিনে তিনবার নিয়মিত ইনহেলার নিতে হয়। ঋতুপরিবর্তনের সময়টাতে একটু বাড়াবাড়ি হয়। সেইসময় অ্যান্টিবায়োটিক ইনহেলার নিতে হয়। সাধারণত ধুলোবালি, ধোঁয়া, কাঠকয়লার পোড়া গন্ধ নাকে গেলেই সর্দি হয়। নাক বন্ধ হয়ে গিয়ে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তাই ডাক্তারবাবু সারাবছরই মুখে মাস্ক পরে থাকতে বলেছেন। আর বলেছেন একেবারেই ঠাণ্ডা লাগানো যাবে না। যেকারণে আমি সারাবছরই ইষদুষ্ণ জলে স্নান করি। বিধিনিষেধ মেনে ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো আমি ভালোই আছি।

বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ অরিন্দম বিশ্বাস বলেন, 'এই শীতকালে কিছু রোগ বেশি মাত্রায় দেখা যায়। ফুসফুসের সংক্রমণ জনিত বা কারণ ঘটিত যে সব সমস্যা দেখা দেয়, তাঁর মধ্যে প্রথমেই বলি নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটিসের কথা। এই নিউমোনিয়া হচ্ছে একটি সংক্রমণ, যা শিশু ও বৃদ্ধদের বেশি হয়। এর কারণ আর কিছুই নয় এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একটু কম থাকে। আমরা প্রধানত এই ধরনের নিউমোনিয়া রোগী বেশি দেখি যারা একটু বাইরে মেলামেশা বেশি করেন। এই ব্যাক্টেরিয়া শরীরে আসে বাইরের ধূলিকণা মারফত। প্রবেশ করার পরে নিউমোনিয়া দেখা দেয়। কী করে বুঝবো যে নিউমোনিয়া হয়েছে? (১) প্রচণ্ড কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসবে, (২) শ্বাসকষ্ট হতে পারে, (৩) শুকনো কাশি হতে পারে, (৪) কাশির সঙ্গে কফ আসতে পারে, (৫) অনেক সময় দেখা গেছে নিউমোনিয়ার কারণে ফুসফুসে জলও জমে যায়। এগুলিই প্রধান উপসর্গ। আর সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করে এটাকে চিহ্নিত করতে হয়। এক্সরের মাধ্যমে এটা বোঝা যায়। তার সঙ্গে থুতু পরীক্ষা করতে হয়। সেরকম প্রয়োজনীয় না হলেও রক্ত পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া হয়। শুধুমাত্র সংক্রমণের মাত্রা বোঝার জন্য।

এই নিউমোনিয়া খুব বিপজ্জনক হতে পারে। আক্রান্তরা অনেকে অসংলগ্ন কথা বলে থাকেন, রেস্পিরেটরি রেট বলে একটা বিষয় আছে, সেটাকে আমরা দেখে নিই এই ক্ষেত্রে। যদি দেখা যায় আক্রান্তের সমস্যা একটু হলেও ক্রিটিক্যাল, সেক্ষেত্রে আমরা তাকে আই সি ইউ পর্যন্ত নিয়ে যাই ভালো আধুনিক চিকিৎসার সাহায্যে সুস্থ করে তোলার জন্য। মনে রাখবেন, নিউমোনিয়ার চিকিৎসা চিকিৎসকের পরামর্শ মেনেই করবেন। আর চেষ্টা করবেন কোনো নিকটবর্তী হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করার। তবে বাড়িতে রেখেও চিকিৎসা করা যায়। এক্ষেত্রে দু' থেকে তিন সপ্তাহ অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপির সাহায্য নেওয়া হয়। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রথমেই একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞর সাহায্য নিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে। সেক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হবে অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপির।

এবার আসি ইনফ্লুয়েঞ্জার কথায়। এই সময়ে এটি ভীষণ ভাবে দেখা দেয়। এটি কিন্তু একটি ভাইরাস সংক্রমণ ঘটিত রোগ। এটিও ব্যাক্টিরিয়ার সংক্রমণের হাত ধরে আসতে পারে। আবার উলটোটাও হয়। এগুলি কিন্তু একজন সংক্রমিত ব্যক্তিকে ভয়ংকর অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে পারে। আমার মতে বাড়িতে না রেখে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করাটাই শ্রেয়। এছাড়াও এই সময়ে অনেকের মধ্যে একটা অ্যালার্জির প্রবণতা দেখা যায়। এই অ্যালার্জি থেকে হাঁপানির প্রবণতা দেখা দিতে পারে। সেটাকেও অবহেলা করলে চলবে না। ইনহেলার বা নেবুলাইজার দ্বারা রোগীকে সুস্থ রাখার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াটা জরুরি বলে আমি করি।'

ফ ঃ ৪

সীমান্ত চেতনা মঞ্চের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

সীমান্ত চেতনা মঞ্চের উদ্যোগে গত ১৬ ডিসেম্বর কলকাতার ভবানীপুর আশুতোষ ভবনে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক সংগীত এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় বীর সেনানীদের বিজয়গাথা নিয়ে আলোচনা হয়। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা ভারতের প্রথম মহিলা পুরোহিতের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শ্রীমতী বাণী মিত্র, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট, সুমিত চট্টোপাধ্যায় এবং সীমান্ত চেতনা মঞ্চের কলকাতা মহানগর সমিতির সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করেন শুভ্রজ্যোতি ঘোষ, রবিশঙ্কর সামন্ত এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংগীতশিল্পী তুষার দে। উপস্থিত ছিলেন সীমান্ত চেতনা মঞ্চের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক সোনালি দে।

এদিনই সীমান্ত চেতনা মঞ্চ বসিরহাট জেলার উদ্যোগে ইছামতী নদীর তীরে আনন্দমেলা আশ্রমে বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ভারতীয় নৌবাহিনীর আধিকারিক সত্যজিৎ রায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন। উপস্থিত ছিলেন সোমা দত্ত, দীপক কুমার ঝা, বাপি দাস, ঋষিকেশ পাল, ডাঃ শৌর্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিবাস দাস এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায়।

সীমান্ত চেতনা মঞ্চ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উদ্যোগে হলদিয়া হেলিপ্যাড ময়দানে বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সংগঠনের ভাবসংগীত 'সরহদ কো প্রণাম' সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি আশিস কুমার মিশ্র। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে যথাক্রমে সিআইএসএফের সিনিয়র কমান্ড্যান্ট শঙ্কর কুমার ঝা এবং ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ডের ডেপুটি কমান্ড্যান্ট সঞ্জয় পাল উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সিআইএসএফ এবং ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ডের বহু অফিসার উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে সীমান্তে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জাগরণে সীমান্ত চেতনা মঞ্চের ভূমিকার কথা স্বীকার করেন। জাতীয় সংগীত গেয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

খড়্গপুরে খাদি ও গ্রামীণ শিল্পোদ্যোগ কর্মশালা

গত ১৯ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর মালঞ্চ রোডের প্রজাপতি লজে মেদিনীপুর লোকসভার সাংসদ দিলীপ ঘোষের উদ্যোগে খাদি ও গ্রামীণ শিল্পোদ্যোগ বিষয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সভায় খাদি কমিশনের পক্ষে ভি শিবকুমার এবং ব্যাংক বিশেষজ্ঞ অনুপ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। কীভাবে খাদি গ্রামোদ্যোগ থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা ও জীবিকা নির্বাহ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সাহায্য করা যেতে পারে সেটা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন তাঁরা।

স্থানীয় বাজারের চাহিদা বুঝে বাজারে পণ্য জোগান দিলে কীভাবে ব্যবসা বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন একজন বাজার বিশেষজ্ঞ। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শমিত দাশ, শুভজিৎ রায়, তপন ভুঞ্যা, ড. শঙ্কর গুছাইত, গোপালী আশ্রমের কুশল কুণ্ডু, খড়্গপুর মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলার অভিষেক আগরওয়াল, অনুশ্রী বেহেরা প্রমুখ।

কেশব ভবনে মহিলা সমন্বয় বৈঠক

গত ১১ ডিসেম্বর কলকাতার মানিকতলাস্থিত কেশব ভবনে মহিলা সমন্বয়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ১৮টি সংগঠন থেকে ৮০ জন মহিলা প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য, প্রদীপ প্রজ্বলন ও দীপমন্ত্র সুভাষিত-সহ বৈঠকের সূচনা হয়। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন অখিল ভারতীয় মহিলা সমন্বয় সংযোজিকা মীনাক্ষী পেসওয়েজী, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির ঋতা চক্রবর্তী, দক্ষিণবঙ্গ মহিলা সমন্বয় সংযোজিকা শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায় এবং মহিলা সমন্বয়ের সম্পর্ক অধিকারী তথা রাষ্ট্রীয় স্বংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক সারদা প্রসাদ পাল।

শ্রীমতী পেশওয়ে তাঁর বক্তব্যে আগামী ২০২৫ সালে সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে মহিলা সমন্বয়ের উদ্যোগের দ্বারা মহিলা সহযোগিতা যাতে প্রতি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায় তার জন্য সারা দেশে বিভাগ সম্মেলনের যোজনার কথা বলেন। বিভাগ সম্মেলনের জন্য তিনি পাঁচজনের একটি সঞ্চালন সমিতি ঘোষণা করেন। সমিতিতে রয়েছেন --- ড. পাপিয়া মিত্র, শ্রীমতী নন্দিনী রায়, শ্রীমতী মহাশ্বেতা চক্রবর্তী, শ্রীমতী পারমিতা দত্ত ও শ্রীমতী শিবানী চ্যাটার্জি। উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও অসমের বিভাগ সম্মেলনের প্রভারী হিসেবে শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়ের নাম ঘোষিত হয়।

বৈঠকে বঙ্গনারী সংকলিত 'নারী সহায়তা প্রকল্প' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের মহিলাদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রোজগার ও সুরক্ষা সম্পর্কিত যোজনাগুলি সংকলিত হয়েছে বলে জানান শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়। তিনি জানান, দক্ষিণবঙ্গে মহিলা সমন্বয়ের কাজ বঙ্গনারীশক্তি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। উপস্থিত নারীশক্তিকে তিনি মহিলা সমন্বয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান করেন এবং বলেন, এই যোজনা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘেরই একটি যোজনা। ১৯৯৩ সাল থেকে এই যোজনা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র কার্যবাহ গোপালপ্রসাদ মহাপাত্র কুটুম্ব প্রবোধনের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। সমাপ্তি ভাষণে ঋতা চক্রবর্তী সঙ্ঘের মতাদর্শে সৃষ্ট বিভিন্ন সংগঠন এবং মহিলা সমন্বয়ের প্রয়োজনীতার বিষয়ে আলোকপাত করেন।

বৈঠক সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন মহিলা সমন্বয়ের দক্ষিণবঙ্গ সহ সংযোজিকা শ্রীমতী নন্দিনী রায় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীমতী শর্মিলা ভট্টাচার্য। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রার্থনার মাধ্যমে বৈঠকের পরিসমাপ্তি হয়।

গাজোলে সারদা শিশু নিকেতনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ১৯ ডিসেম্বর মালদা জেলার গাজোল থানার হরিপুর গ্রামে শ্রীমতী দৈবকীদেবী সারদা শিশু নিকেতনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় হরিপুর ফুটবল মাঠে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিশু নিকেতনের পরিচালন সমিতির সভাপতি রামপদ সরকার। প্রধান অতিথি রূপে ছিলেন সংস্কার ভারতী মালদা জেলার সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার। উপস্থিত ছিলেন পরিচালন সমিতির সহ সভাপতি আশারু সরকার। সারাদিন ধরে চলা শিক্ষার্থীদের ক্রীড়া প্রদর্শন এলাকার মানুষজনকে মুগ্ধ করে। সূর্য নমস্কার ও সমবেত ব্যায়ামযোগ প্রদর্শন ছিল খুবই আকর্ষণীয়। পুরস্কার বিতরণ ও রাষ্ট্র বন্দনার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

সিউড়ি অরবিন্দপল্লী সরস্বতী শিশুমন্দিরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ১৮ ডিসেম্বর বীরভূম জেলার সিউড়ি অরবিন্দপল্লী সরস্বতী শিশুমন্দিরের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অরুণ থেকে

সপ্তমশ্রেণীর পড়ুয়ারা অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিশুমন্দিরের পরিচালন সমিতির সভাপতি লক্ষ্মণ বিষ্ণু। উপস্থিত ছিলেন পরিচালন সমিতির সম্পাদক পরিতোষ হাজরা, শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য এবং সমস্ত আচার্য-আচার্যা। শিক্ষার্থীদের সমবেত ব্যায়ামযোগ সকলকে মুগ্ধ করে। পতাকা অবতরণের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন
মুম্বাই শাখার শতবর্ষের আবির্ভাব অনুষ্ঠান

১৯২৩ সালে ভারতের সাংস্কৃতিক নগরী কাশীতে কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালির প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন ২০২২ সালে শতবর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। প্রথম বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেশজুড়ে অন্যান্য শাখা সংগঠনের মতোই মুম্বাই শাখার সাহিত্যপ্রেমী সদস্যরাও গত ১৮ ডিসেম্বর মুম্বাইয়ের আন্ধেরি ভবনস কলেজের এপিজে প্রেক্ষাগৃহে ‘শতবর্ষের আবির্ভাব অনুষ্ঠান’ পালন করেন। সকাল দশটায় প্রদীপ প্রজ্বলন ও মুম্বাই শাখার বার্ষিক পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। মানপত্র প্রদান করা হয় মুম্বাইয়ের চারজন বিশিষ্ট কৃতী বাঙ্গালি— ড. দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, শ্রীমতী ছায়া গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী ইন্দ্রাণী আচার্য ও প্রতীক চক্রবর্তীর হাতে। সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ রায় ও সম্পাদক শঙ্কর মৈত্রর সাহিত্য সম্পর্কিত বক্তব্য উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠানে সুজয় সেন ও ধৃতি গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় কবিতা পাঠ, সেতার বাদনের আয়োজন করা হয়। দুপুরে সহভোজেরও ব্যবস্থা ছিল। মুম্বাইয়ের সাহিত্যমনস্ক বাঙ্গালিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

গোপাল চক্রবর্তী

ভারতের সুদীর্ঘ মুক্তিসংগ্রামে শ্রীশ্রী গীতার অনন্য সাধারণ ভূমিকা অবিস্মরণীয়। গীতার নিষ্কাম কর্মোদ্যোগ, আত্মসমর্পণ যোগ, আত্মতত্ত্ব এবং স্থিতপ্রজ্ঞত্বের আদর্শই মুখ্যত দেশের ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের মুক্তিসংগ্রামীদের জীবনকে পরিচালিত করেছিল। ভারতের প্রায় সকল বিপ্লবীরই অনুপ্রেরণা ও পাথেয় ছিল এই মহাগ্রন্থ। তাই গীতা ছিল বিপ্লবীদের একমাত্র আশ্রয়। আবার অহিংস সংগ্রামীরাও গীতার বাণীতেই পেয়েছেন আদর্শের প্রেরণা।

বিশ্বসভ্যতায় ভারতের শ্রেষ্ঠ দান শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা। ভারতীয় শাশ্বত সংস্কৃতির নির্যাস এই দিব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়— 'ভারতের কুটীরে দীর্ঘদিনের বিনা তৈলের জলন্ত প্রদীপ এই গীতা। রাজনৈতিক গোষ্ঠী, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, বিত্তশালী এবং সম্প্রদায় বিশেষের বিনা পৃষ্ঠপোষনেই এই গ্রন্থ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণসাহিত্য। পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ, শিক্ষক, সৈনিক, কর্মী, ব্যবসায়ী, ছাত্র, শ্রমিক, ত্যাগী-ভোগী সর্বজনের কাছে এই দিব্যগ্রন্থের সমান আবেদন। নিষ্কিঞ্চন তপস্বী, নির্জন গুহাবাসী থেকে হর্ম্যবিলাসী ধনী, সর্বকর্মত্যাগী সন্ন্যাসী থেকে সদা কর্মনিষ্ঠ রাজনীতিবিদ— সকলেই গীতা থেকে পাথেয় পেয়ে থাকেন।'

শুধু ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের সর্বত্র মনীষীদের কাছে গীতা অনন্য সাধারণ গ্রন্থ। ইংরেজ মনীষী কার্লাইল মার্কিন মনীষী এমারসনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে গীতা গ্রন্থ উপহারের মাধ্যমে সৌহার্দ্যকে করেছেন সুদৃঢ়। সহিংস ও অহিংস ভারতের মুক্তিসংগ্রাম উভয় পথের পাথিকদের আদর্শের পার্থক্য থাকলেও লক্ষ্য ছিল এক— পূর্ণ স্বাধীনতা। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের মন্ত্রও ছিল এক— 'বন্দেমাতরম্'। আর তাঁদের পাথেয়ও ছিল এক, তাহলো 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'। তাই বিপ্লবী যোগী ঋষি অরবিন্দ, চরমপন্থী নেতা লোকমান্য তিলক, আবার অহিংস সংগ্রামী মহাত্মা গান্ধী, ভূদান আন্দোলনের প্রবর্তক আচার্য বিনোবা ভাবে গীতা প্রবচনে সমুৎসুক, রচনাও করেছেন স্ব স্ব আদর্শের আলোকে গীতার বিশাল ভাষ্য। এঁরা সকলেই আবাল্য গীতাধ্যায়ী। মহাসংগ্রামী সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস নেতা হিসেবে কারাগার থেকে সহকর্মী তরুণদের উদ্দেশে নিত্য গীতাপাঠের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র সিঙ্গাপুরে অবস্থানকালে সেখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজের কাছ থেকে একটি গীতাগ্রন্থ চেয়ে নিয়েছিলেন।

বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বিনয়-বাদল-দীনেশ, সূর্যসেন প্রমুখ দধীচিদের ঘরে, দলে ও জেলে গীতা ছিল নিত্যপাঠ্য। গীতার আধ্যাত্মিক

শক্তিতে বলীয়ান হতে পেরেছিলেন বলে তাঁরা হয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী। ফাঁসির মঞ্চে যাবার আগে ইংরেজ বিচারক ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

—তোমার কি ভয় করছে?

উত্তরে এই বীরবালক বলেছিলেন—

—ভয় করবে কেন? আমি কি গীতা পড়িনি?

এই হলো গীতার অন্তর্নিহিত শক্তি। বিশ্বের ইতিহাসে কোনো ধর্মগ্রন্থের এরকম সর্বজনীন প্রভাব ও প্রয়োগ আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। অথচ এখন আমরা সেই গীতাকে শুধুমাত্র পরলোকগত আত্মার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে কোনোরকমে স্থান দিয়ে যেন তার মর্যাদা রক্ষা করে চলেছি এবং পরিজনবর্গের শোকসন্তপ্ত প্রাণে কিঞ্চিৎ শান্তির প্রলেপ রূপে সদ্ব্যবহার করার আয়োজন মাত্র করেই এই মহাগ্রন্থকে যেন কৃতার্থ করে দিচ্ছি। গীতার বাণীর যথার্থ প্রয়োগ, বিনিয়োগ বা সদুপযোগ যদি আমরা করতে পারতাম তাহলে ব্যক্তির জীবনে, সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রজীবনে সাম্য, সৌষম্য অনায়াসে সংস্থাপিত হতো, আমরা শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে নির্ভয়ে অগ্রসর হতে পারতাম।

গীতার কর্ম নিষ্কাম কর্ম। গীতার যোগ হলো অনাসক্তিযোগ অর্থাৎ কর্তৃত্ব, কর্ম ও কর্মফলের প্রতি আসক্তি না রেখে শুধু ভগবৎ স্বভাবে ও সঙ্গে যুক্ত থেকে সমত্ববোধে তার জন্য যোগ সাধনা। গীতার জ্ঞান হলো সমজ্ঞান— সর্বভূতে এক জ্ঞান। গীতার ভক্তি হলো সমভাব ও বোধে অন্তরে-বাহিরে পুরুষোত্তম বা অখণ্ড এক আমি'র সেবা করা। অর্থাৎ অখণ্ড ভাব বোধে, আপন বোধে জীবনে সব কিছুকে অন্তরে বাইরে মানিয়ে চলা। প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামী, তিনি সহিংস পথেরই হোন, কিংবা অহিংস পথের হোন, গীতাই ছিল তাঁদের জীবন বেদ। কারণ গীতার পরমমন্ত্র একটিই— আপন আপন কর্মে প্রবৃত্ত হও। কর্মেই তোমার অধিকার... 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মাফলেষু কদাচন'।

অতএব ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে নিষ্কাম কর্ম করে যাও তাতেই তোমার সংসিদ্ধি। পৃথিবীতে গীতাই হলো একমাত্র ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মগ্রন্থ। গীতা পূজা-অর্চনা, জপ-তপ করার কথা বলে না। বলে তোমার কর্ম দিয়েই তাঁর অর্চনা করো। কার অর্চনা করব? তাহলে তো ঘুরে ফিরে আবার সেই ভগবান, ধর্মকর্মই এসে পড়বে বলে আশঙ্কা জাগতে পারে। ভগবানকে বা ধর্মকে এমনই সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখেন বলেই তথাকথিত প্রগতিবাদীরা ধর্মের নামে আতঙ্কগ্রস্ত হন। ভগবানের নামে বিরূপ হন। প্রগতির নামে সবকিছু নিরাকরণের নেশায় মেতে তাঁরা ভুলে যান সেই আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠানের কথা যার উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, যাকে ঘিরে এই সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হচ্ছে যে অক্ষরের প্রশাসনে সূর্য চন্দ্র বিধৃত হয়ে আছে। অগ্নি তাপ দিচ্ছে, বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, প্রতি জীবে জীবে হৃদস্পন্দন ধ্বনিত হয়ে চলেছে।

গীতার আহ্বান তাই মুক্ত জীবনের জন্য, স্বচ্ছন্দ জীবনের জন্য, আপনার স্বরূপে বিশ্ব-ঐক্যবোধে প্রতিষ্ঠিত জীবনের জন্য। এখানে কোনও শিক্ষা চাপিয়ে দেওয়া হয়নি, ভগবান বলেছেন বলে মেনে নিতেও বলা হয়নি। বলা হয়েছে, সবদিক ভালোভাবে নিজে ভেবে চিন্তে যা ইচ্ছা তাই করো—

'বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু।'

এরকম স্বাধীনতা কি কোনো গুরু কোথাও দিয়েছেন তাঁর শিষ্যকে, কোনও ধর্মগ্রন্থে? কারণ ভগবান জানেন, তিনি বলেই মুক্ত, করতে হবে তাকেই, যে শ্রোতা। তাঁকে কর্মে প্রবৃত্ত হয়েই ইষ্টসিদ্ধি লাভ করতে হবে। মানুষকে তাই লড়তে হবে নিজেকেই নিজের বিরুদ্ধে, তার সংকীর্ণ স্বার্থপর সত্তার বিরুদ্ধে। গীতায় অবিরাম এই সংগ্রামের। এই যুদ্ধের প্ররোচনা—

উত্তিষ্ঠ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয় যুধ্যস্ব বিগত জ্বরঃ।

অস্বাদ্ যুধ্যস্ব ভারত জহি শত্রুং মহাবাহে।।

ভগবান আশ্বাস দিয়েছেন, লড়বে তুমি একাই, কিন্তু আমি চিরসাথী সনাতন সখা হয়ে থাকব তোমার পাশেই প্রেরণা জোগাতে, পথ দেখাতে, সারথি রূপে। তাই তুমি আমাকে সর্বদাই স্মরণ করো আর যুদ্ধ করে যাও। গীতার এই একটি আশ্চর্য দিক যোগেশ্বরের সঙ্গে ধনুর্ধরের, নরের সঙ্গে নারায়ণের নিবিড় মিলন। এটি সংসাধিত হলেই জীবনে শ্রী বা সুষমা, বিজয়ের গরিমা, ভূতি বা সমৃদ্ধি, অটল ন্যায়নীতি সবকিছু সুনিশ্চিত।

মহাভারতের শ্রেষ্ঠ টীকাকার নীলকণ্ঠ সুরি তাঁর গীতা ব্যাখ্যায় বলেছেন—

'ভারতে সর্ববেদার্থো
ভারতার্থশ্চকৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং
সর্বশাস্ত্রময়ীগীতা।।

মুঘল শাসক শাজাহানের পুত্র দারাশিকো লিখেছিলেন— 'গীতা স্বর্গীয় আনন্দের অফুরন্ত উৎস। সর্বোচ্চ সত্যলাভের সুগম পথ গীতায় প্রদর্শিত। গীতায় পরম পুরুষের কথা বিবৃত এবং ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যাত। গীতা ইহলোক ও পরলোকের সুগভীর ও শ্রেষ্ঠ রহস্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন।'

মুক্তিসংগ্রামের পর্যায় কবে শেষ। ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষের দিকে দিকে আজ অশান্তির আগুন। বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদের হিংস্র আক্রমণে বিপর্যস্ত মানবতা। এই ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে আমাদের আজও মুক্তি দিতে পারে গীতার চেতনা। একমাত্র গীতাই সঙ্ঘবদ্ধ করতে পারে আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী ভারতবর্ষকে। □

শুধু অঙ্কের জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন শ্রীনিবাস রামানুজন

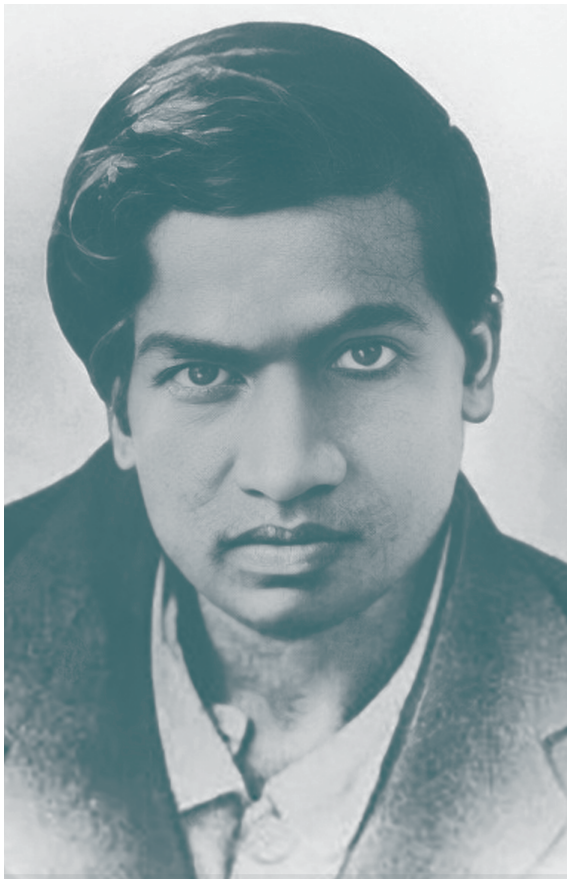

দীপক খাঁ

জীবনে খ্যাতি সম্মান কিছুর প্রচেষ্টা রাখেননি তবুও তিনি বিখ্যাত গণিতবিদ হয়েছিলেন। জীবনকাল মাত্র ৩২ বছর। E.T. Bell তাঁর বিশ্বখ্যাত 'ম্যান অব ম্যাথমেটিক্স' গ্রন্থে বিংশশতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ হিসেবে তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। দক্ষিণ ভারতে কাবেরী নদীর তীরবর্তী এজের শহরে জন্ম। পৈতৃক ভিটে ছিল কুম্ভকোনম শহরে। বাবার নাম নিবাস আয়েঙ্গার। আর্থিক অবস্থা মোটেও ভালো ছিল না। ঠাকুর্দা, ঠাকুমা, বাবা, মা তিন ভাই— এই নিয়ে তাঁদের সংসারে সাতজন সদস্য। বাবার আয় মাত্র কুড়ি টাকা। সবকিছু সামলে রামানুজের পড়ার খরচ মেটানো সম্ভব হচ্ছিল না। বৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম হওয়ায় তাঁকে স্কুলে হাফ ফ্রি করে দেওয়া হলো। রামানুজন যতই উঁচু ক্লাসে উঠতে থাকেন ততই তিনি অঙ্কের বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠতে থাকেন।

রামানুজনের বাড়িতে কয়েক জন কলেজ ছাত্র ভাড়া থাকত। তারা অঙ্কে রামানুজনের ব্যুৎপত্তি দেখে কলেজের অঙ্কের বই এনে দিত। এই সময় তিনি 'A synopsis of Elementory Results in pure and Applied Mathematics' নামে একটি বই পান। লেখক এক ইংরেজ পণ্ডিত। বইটিতে কয়েক হাজার বিভিন্ন ধরনের জটিল প্রবলেম দেওয়া ছিল। প্রবলেমগুলির সমাধান কোথাও দেওয়া ছিল না, মাঝে মাঝে শুধু কয়েকটি সূত্র দেওয়া ছিল। তাঁর অমানুষিক পরিশ্রম আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একের পর এক জটিলতার দ্বারোদ্ঘাটন করতে থাকেন। তিনি একের পর এক নির্ভুল সূত্র আবিষ্কার করতে থাকেন। তাঁর অনেক আগে ইউরোপীয় গণিতজ্ঞরা যে সমস্ত অঙ্কের সূত্র উদ্ভাবন করেছিলেন যেগুলো না জেনেই স্কুলের ছাত্র থাকাকালীন সেই সমস্ত সূত্রের সমাধান করেন। ১৫ বছর বয়সে সম্মানের সঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কুম্ভকোনম কলেজের ইন্টারমিডিয়েট বিভাগে ভর্তি হলেন— বিষয় সাহিত্য, ইতিহাস, শারীরবিদ্যা ও সংস্কৃত ভাষা। অঙ্কের প্রতি বেশী মনোনিবেশ করার জন্য অন্যান্য বিষয়গুলির প্রতি অবহেলার কারণে প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেন না, ফলে বৃত্তি পাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

এদিকে বাড়ির আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। মানসিক ভাবে ভেঙে পড়লেন রামানুজন। কলেজে উপস্থিতির হার কম থাকায় কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে বছরের শেষে পরীক্ষায় বসার অনুমতি দিলেন না। মনের দুঃখে রামানুজন মাদ্রাজ চলে গেলেন এবং সেখানকার একটি কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হলেন। অতি কষ্টে টিউশানি করে নিজের পড়াশোনার খরচ চালাতেন। অর্ধেক দিন ঠিকমতো খাওয়া জুটত না। বার্ষিক পরীক্ষা শুরুর কয়েকদিন আগে হঠাৎই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেবার আর পরীক্ষায় বসতে পারলেন না। আবার কুম্ভকোনমেই ফিরে এলেন। কয়েক মাস পড়াশোনা করে কুম্ভকোনম কলেজ থেকেই পরীক্ষা দিলেন। কিন্তু এবারও অকৃতকার্য হলেন। ভাবতে বিস্ময় লাগে যে যিনি অঙ্কশাস্ত্রের ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, ভারতবর্ষে সেই সময় তাঁর সমকক্ষ প্রায় কেউ ছিল না, তিনি সামান্য কলেজের পরীক্ষাতে চারবারের চেষ্টাতেও উত্তীর্ণ হতে পারেননি।

পরবর্তীকালে এক ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত বলেছিলেন, আমাদের দেশের অপদার্থ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য যে কত প্রতিভা বিনষ্ট হতে পারে তাঁর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে রামানুজনের নাম বলা যেতে পারে। কুম্ভকোনম কলেজ তাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রের প্রতি যে অবহেলা করেছিল তার ফলে জাতির এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল। প্রতিবেশীরা বাবা-মাকে ছেলের বিয়ে দেবার পরামর্শ দেন। চাপের কাছে নতি স্বীকার করে রামানুজন বিবাহ করেন ২২ বছর বয়েসে। কুম্ভকোনমে চাকুরির সুযোগ না থাকায় মাদ্রাজে গেলেন। সেখানে পরিচিত একজনের বাড়িতে থেকে চাকরির চেষ্টা শুরু করলেন। একদিন হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হলো স্কুলের বন্ধু সি.

রাজাগোপালাচারীর। সব শোনার পর রাজাগোপালাচারী তাঁকে নিয়ে গেলেন গণিত সোসাইটির সম্পাদক রামচন্দ্র রাওয়ের কাছে। রামানুজনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে তাঁর চেহারার বিবরণ দিয়েছেন রামচন্দ্র রাও। কুৎসিত চেহারা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ দুটো আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল। কিছুদিনের মধ্যেই রামানুজনের প্রতিভাকে উপলব্ধি করতে পারলেন রামচন্দ্র রাও। তিনি প্রতিমাসে পঁচিশ টাকা করে মাসোহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ম্যাথামেটিকাল সোসাইটির একটি পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হলো— 'Some properties of Bernaowlis numbers.' বেশ কয়েকমাস গবেষণার কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন রামানুজন। তাঁর মনে ভাবনা এল, নিজে একজন সমর্থ পুরুষ হয়ে অন্যের সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকা তো অপমানের শামিল। কাজেই রামচন্দ্রকে জানিয়ে দিলেন তিনি টাকা নিতে পারবেন না। রামানুজনকে খুবই ভালোবাসতেন রামচন্দ্র। মাদ্রাজ পোর্টট্রাস্টের ম্যানেজার নারায়ণ অয়ারয়ের সঙ্গে রামচন্দ্রের পরিচয় ছিল। রামানুজন তাঁর প্রচেষ্টায় পোর্টট্রাস্টের অফিসে ক্লার্কের চাকরি পেলেন। মাইনে ২৫ টাকা। রামানুজন তখন ২৪ বছরের যুবক। চাকুরি পেয়ে কিছুটা স্বস্তি পেলেন। মাদ্রাজে একটি ছোটো বাড়ি ভাড়া নিলেন— মা, আর স্ত্রী জানকীকে সেখানে নিয়ে এলেন। কিন্তু সংসার চালাতে লেখার কাগজ কেনার পয়সা থাকে না। লেখার জন্য চার-পাঁচ রিম কাগজ প্রয়োজন। তাই তিনি অফিসের ফেলে দেওয়া কাগজ এনে তাতেই তিনি অঙ্ক কষতেন। তিনি ক্রমশই অনুভব করলেন— ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভা অনুযায়ী অঙ্ক করো এবং তার গভীরতায় সন্তরণের মধ্যে তাঁর আনন্দ। এই আনন্দ আবহে তাঁর মনে হলো দেশের পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করে নিজের অন্তরের অভিলাষ পূরণ সম্ভব নয়। এবার তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গণিতবিদদের কাছে তাঁর উদ্ভাবিত সমস্ত ফর্মূলা চিঠি লিখে জানাতে থাকলেন। তাঁদের কাছে নিজের কাজের মতামত জানতে চাইতেন। কিন্তু পরিচয়হীন, ডিগ্রিহীন পরাধীন দেশের এক মানুষের চিঠির মূল্য কেউ দিল না।

সেই সময় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্ক বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জি.এইচ. হার্ডি রামানুজনের পাঠানো চিঠি একদিন পেলেন। চিঠির সঙ্গে ছিল কয়েক পাতা ফর্মূলা। কিন্তু কোনো ফর্মূলাই প্রমাণ করে দেখানো নেই। প্রমাণ করতে হবে যে ফর্মূলাগুলি সঠিক কিনা? চিঠিটি পেয়ে হার্ডি অবাক হলেন। বিরক্ত হয়ে হার্ডি চিঠি সরিয়ে রেখে নিজের কাজে মন দিলেন। পরদিন সকালে বসবার সময় তাঁর মনে হলো চিঠিটা সত্য কিনা তা প্রমাণ না করে এটাকে ফেলে দেওয়া ঠিক হবে না। কাজেই তিনি সহকারী লিটিল উডকে ডেকে পাঠালেন। তারপর প্রত্যেক ফর্মূলা প্রমাণ করার জন্য তাঁরা অঙ্ক কষতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! প্রত্যেকটি ফর্মূলাই সঠিক শুধু তাই নয়, এযাবৎকাল ইউরোপীয় গণিতজ্ঞরা যে সমস্ত কাজ করে গেছেন অঙ্কের উপর এগুলি তার চেয়েও আরও উন্নত ও সঠিক। প্রকৃতপক্ষে হার্ডি সেদিন রামানুজনের প্রতিভাকে স্বীকৃতি না দিলে রামানুজন হয়তো বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতেন। এমন জ্ঞানতাপসের সন্ধান পৃথিবীর মানুষ পেত না। রামানুজনের প্রতি শ্রদ্ধায় হার্ডি বলেছিলেন— এক দরিদ্র হিন্দু তরুণ তার অসাধারণ মেধা দিয়ে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছেন।

পরদিনই তিনি রামানুজনের চিঠির উত্তর দিলেন। রামানুজন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। এরপর নিয়মিত ভাবে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান শুরু হলো। রামানুজন তাঁর উদ্ভাবন করা নতুন ফর্মূলা হার্ডিকে লিখে পাঠান। হার্ডি সেই সমস্ত ফর্মূলাগুলির মূল্যায়ন করতেন এবং ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পত্রপত্রিকায় তা প্রকাশ করতেন। কিছুদিন পর হার্ডি বুঝতে পারেন রামানুজন প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে কাজ করেছেন।

এই বিষয়টি জানিয়ে তিনি প্রথমে চিঠি লিখলেন ভারতের শিক্ষা বিভাগের পরিচিত কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছে। তারপর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে সবিস্তারে চিঠি লিখে জানালেন। তাঁর মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার জন্য রামানুজনকে মাসিক ৭৫ টাকার বৃত্তি দেয়। হার্ডিকে চিঠি লিখে জানালেন, 'মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে দু' বছরের জন্য বার্ষিক ৬০ পাউন্ডের বৃত্তি মঞ্জুর করেছে।'

এক একদিন তিনি ৮-১০টি করে ফর্মূলা উদ্ভাবন করতেন। তাঁর কাজ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতেন হার্ডি। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি যে পরিমাণ কাজ করেছিলেন, একজন গণিতজ্ঞ সারা জীবনও তাঁর অর্ধেক কাজ করতে পারে কিনা সন্দেহ। ইংল্যান্ডে গিয়ে রামানুজন অনেক জ্ঞানী মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। কিন্তু নিজের আজন্মলালিত সংস্কার, আচার-ব্যবহার ত্যাগ করতে পারেননি। নিয়মিত পূজা, উপবাস, ঠাণ্ডার মধ্যেও স্নান করা সবই করতেন। অনেক কিছু খেতেন না, ফলে তাঁর শরীর ক্রমশই অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। হার্ডি বেশ বুঝতে পারলেন এই ভাবে চললে রামানুজন মারা পড়বেন। তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চিঠি লিখেন। ততদিনে রামানুজন লন্ডনের রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন। মাদ্রাজের পণ্ডিত মহলে অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁকে বছরে ২৫০ পাউন্ড অর্থাৎ মাসে প্রায় ৩১৫ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু রামানুজন একজন সৎ নিরহংকারী মানুষ ছিলেন। রামানুজন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি লেখেন— 'যে অর্থ আপনারা মঞ্জুর করেছেন তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। উদ্বৃত্ত অর্থ গরিব-দুখী ছেলে-মেয়ের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা যেতে পারে।' নিজের দুঃখ দিয়ে তিনি অন্যদের দুঃখকে অন্তর থেকে অনুভব করতে পারতেন। ভারতবর্ষে ফিরে আসার কয়েক মাস আগে হার্ডির চেষ্টায় তিনি কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ফেলোশিপ পান। তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। যে মানুষটি নিজের দেশে সামান্য ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বারবার অকৃতকার্য হয়েছেন তাঁকেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানিত করল।

বিখ্যাত গণিতবিদ ইউলিয়াম গোসপার ১৯৪৫ সালে পাইয়ের মান ১.৭৫ কোটি ঘর দশমিক পর্যন্ত নির্ণয় করার জন্য একটি কম্পিউটার অ্যালগোরিদম লেখেন। এই কাজটা করার পরে তিনি দেখেন যে, রামানুজন বহু বছর আগেই তা নির্ণয় করেছিলেন। রামানুজন সম্পর্কে ইউলিয়াম গোসপার বলেছিলেন, 'যে মানুষটি কবরের তলা থেকে হাত বাড়িয়ে আমাদের সাধনার সুফল কেড়ে নেয় তাঁকে কেমন করে ভালোবাসি?' □

পশ্চিমবঙ্গকে পিছন দিকে এগিয়ে দিয়েছে তৃণমূল

জাহ্নবী রায়

রাজ্যের শাসক দলের পারিবারিক কর্পোরেট ব্যবসায় এখন একটু মন্দা ভাব। তাঁদের ব্র্যান্ড 'ব' যে একটি পরিবারের শাসন ব্যবস্থার প্রতীক, মানে সিম্বল, সেটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে সাধারণ মানুষের কাছে। মানুষ এটা জেনে গেছে যে অতীতের রাজারা যেমন তাঁদের শাসন ব্যবস্থাকে ইতিহাসে স্থান করে দেবার জন্য কিছু একটা প্রতীক রেখে যেতেন, এটাও সেরকম। মহম্মদ বিন তুঘলক থেকে মুর্শিদকুলি খাঁ, আবার শাহাজান থেকে সিরাজউদ্দৌলা, সবাই তাই করেছেন। আমাদের রাজ্য সেই অতীত ইতিহাসকেই অনুসরণ করল। কালীঘাটের শাসক পরিবার এসেই রাজ্যের পরিচয় একটি অক্ষরে এনেই থেমে গেলেন। তাঁরা চলে গেলেও যে 'ব' থেকে যাবে, এটাও তাঁরা বাঙ্গালি সেন্টিমেন্ট নিয়ে চাল চেলে দিলেন। আর রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার পরিচিতির ইতিহাসের পাতায় একটা স্থায়ীকরণ হয়ে গেল। এই রাজ্য যে এক সময়ে ব্যানার্জিরা শাসন করত, সেটা শত বছর পরে গবেষকরা গবেষণা করতে এলে অবশ্যই ইতিহাসের এই উপাদানকে খুঁজে পাবেন। যেমন ভাবে পাঠ্য বইতে স্থান পেয়েছে সিঙ্গুর।

দুর্জনেরা নানা কথা বলে, তাতে কার কী এসে যায়? অনেকে আবার বলছেন, নির্লজ্জরা আর দু' কানকাটারা চলে রাস্তার মধ্যখান দিয়ে। এহেন বাকবিতণ্ডার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল এগারোটা বছর। শাসন ব্যবস্থার ঝুলিতে দুর্নীতি আর চোর শিরোপার পাশাপাশি শাসকদলের রাঘববোয়ালরা জেলের মধ্যে। সারা দেশে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫তম বছরে এহেন কৃতিত্ব আর কারো আছে বলে জানা নেই।

এগারো বছরে নানা শিল্পের কথা শোনা গেছে। কখনো চপ শিল্প বা কখনো ঝালমুড়ি শিল্প। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে

কাশফুলের বালিশ শিল্প। দুর্জনেরা বলছেন, একটি শিল্প আবার পত্র-ফুল-পল্লব শোভিত। নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন সেটি আবার কী? সেটি বোমা শিল্প, বন্দুক শিল্প, সন্ত্রাস শিল্প। তবে দুর্জনেদের মতে সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সাগরেদদের দেওয়া স্বপ্নের 'ঢপ শিল্প'। মাদক পাচারের ক্ষেত্রে একেবারে সিল্ক রুটের থেকে ডায়মন্ড রুটের চেহারা নিয়ে কড়িডোর হয়ে উঠেছে আমাদের এই রাজ্য। দুর্জনেরা বলছেন গোরু, কয়লার সঙ্গে এই মাদক পাচারও একটা শিল্পের রূপ নিয়েছে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে না বলাই ভালো। এই দুটোতে পশ্চিমবঙ্গকে সবাই সেলাম করত একটা সময়। বলত, 'যা আজ বাঙ্গলা ভাবে, সেটাই ভারত ভাবে এক দিন পরে।' সেটা এখন অতীত। শিক্ষাব্যবস্থায় বিহার, ঝাড়খণ্ড আজ যেটা ভাবে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ভাবে তিন বছর বাদে। উচ্চ শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ কোথায় পিছিয়ে পড়েছে, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। দক্ষিণের রাজ্যগুলি বাঙ্গালির মেধা ব্যবহার করে কোথায় এগিয়ে গেছে। আর পশ্চিমবঙ্গ পিছচ্ছে তো পিছচ্ছে। আইপিএস, আইএএস, ইউপিএসসি সমেত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সাফল্যের হার হাতে গোনা। তাহলে কি বলা ভালো, বাঙ্গালির মেধা শেষ? তা নয়, এখানকার কিশোর থেকে যুবক-যুবতীরা একটা হতাশা ও নৈরাশ্যের আবহে অবসাদগ্রস্ত হয়ে মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত। তাঁদের চোখে স্বপ্ন নেই, হারিয়ে গেছে আশাও। রাজনৈতিক ডামাডলের মধ্যে পড়ে তাঁরা আজ দিশেহারা। তাঁদের পথের দিশারি হয়ে উঠতে পারেনি রাজ্যের পূর্বতন ও বর্তমান শাসক দল। চাকরি দুর্নীতি এক চরম ঘা মেরেছে শিক্ষিত বেকারদের মাথায়। তাঁরা চাকরির পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে, মেধা তালিকায় থেকে যখন সুখ স্বপ্নে বিভোর, সেই সময়ে তাঁদের চাকরি হয়ে গেল চুরি। আর মেধা খালিপেটে রাস্তায় বসে শত শত দিন নিজের অধিকার চাইছে। বামেরা যদি আটষট্টি বছর পশ্চিমবঙ্গকে পিছিয়ে দেয়, তো বর্তমান তৃণমূল সরকার পিছিয়ে দিয়েছে একশো ছত্রিশ বছর। □

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ও
অরিত্র ঘোষ দস্তিদার

ঔপনিবেশিক প্রভাবকে সনাতনী সৌকর্যে অতিক্রম করবে ভারত

খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারে ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি ফেস্টিভ্যাল আর কার্নিভালের বিপুল আয়োজন নির্ধারিত হয়েছিল। কেক, পেস্ট্রি, ক্রিসমাস ট্রি, সান্টাক্লজ আর নেটিভদের জাঁকজমকে ক্রিস্টান দেশগুলোই কেবল নয়, তার কলোনিগুলোও ভরিয়ে দিয়েছিল খ্রিস্টীয় আবহের মহা মোড়ক। খ্রিস্টানরা বিভিন্ন দেশে অন্য দেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছিল শাসকের চেয়ারে বসে, ঔপনিবেশিক চোখ রাঙিয়ে। ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যে দেশের সনাতনী সমাজ তৎকালীন সময়কালের মধ্যেই আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছিল হিন্দুধর্মের উৎসব আয়োজনের পরীক্ষনিরীক্ষা। তাই অতিক্রম করতে পেরেছিল এক অভূতপূর্ব হিন্দু সৌকর্যে।

স্বামীজী জানতেন একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমণ্ডলে ভারত-সহ প্লাবিত হবে বিশ্বের নানান অংশ। তাই বড়দিনের মতো দিনটিতে 'সনাতনী-বীজ' বপন করতে শুরু করে দিলেন তিনি। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু দিবসই ছিল তাঁর পথ, তাঁর প্রেরণা। এটা কলোনিয়াল প্রভাবমুক্তিরই সাধনা। সাধনা ২৫ ডিসেম্বর ও পয়লা জানুয়ারিকে অতিক্রমের। এই দিনগুলিতে বরং মানুষ গির্জামুখী না হয়ে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়মঠমুখী হয়ে বেশি করে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণ-মনন ও পূজন করুক। অন্যান্য মঠ-মন্দিরগুলিও যদি এগিয়ে আসে তো আসুক। তারাও তাদের ভক্তমণ্ডলীকে সমবেত করে নিজ নিজ আচার্যদের ভাবধারা এই সময়কালের মধ্যে প্রচার করে সনাতনী হিন্দু সমাজের সামগ্রিক ধর্ম-সংস্কৃতিকে সুদৃঢ় করুক। একাজ তারা শুরুও করেছে নীরব অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে। ২৫ ডিসেম্বর তুলসীপূজন এমনই এক অনুষ্ঠান। ২৪ ডিসেম্বর খ্রিস্টমাস ইভের দিনে স্বামীজীর ধুনি প্রজ্বলনও আর একটি নীরব অভ্যুত্থান।

১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু হয়েছিলেন। বাঙ্গালি তথা বিশ্ববাসীকে চৈতন্য জাগরণের আশীর্বাদ করেছিলেন তিনি। তাই তাঁর অবতারত্বে অবগাহন করতে চেয়েছে চৈতন্যের সমুদ্র। কিন্তু বেছে বেছে খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের প্রথম দিনটিকে ভারতবর্ষে 'কল্পতরু'র ভাব-আয়োজন কেন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ? কেনই-বা তাঁর প্রধান শিষ্য ১৮৮৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর হুগলীর আঁটপুরে সন্ন্যাসীর ধুনি জ্বালালেন? কেনই-বা ১৮৯২ সালের ২৫ ডিসেম্বর কন্যাকুমারীর শিলাখণ্ডে বসে অখণ্ড ভারতের সাধনায় নিমগ্ন হলেন স্বামীজী ? কেনই-বা কলোনিয়াল ফেস্টিভালের মেজাজে প্রতিস্পর্ধী হিন্দুত্বের বাতাবরণ তৈরি

হলো? কেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিধন্য হয়ে ১ জানুয়ারির মধ্যে ব্যাপক ছোঁয়া লাগলো? এসব কি নিছকই একটি দিন? নাকি একটি প্রতিস্পর্ধী প্রভাব থেকে সনাতনী হিন্দু সমাজকে উত্তরণে নিয়ে যাওয়ার ঐশীপ্রয়াস এই দিনগুলি? বাঙ্গালি কি কল্পতরু দিবস যথাযথরূপে বিশ্লেষণ করে দেখেছে? দেশীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষার ধারা পরিবর্তন করে মেকলে সাহেব ১৮৩৫ সালে যে শিক্ষানীতি প্রচলন করতে চাইলেন, পরের বছরই তা ভাঙার আয়োজন হলো। ১৮৩৬ সালে জন্ম নিলেন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ— 'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে'। কলোনিয়াল কৌশল ভাবজগতে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি অপ্রকটের আগে ঔপনিবেশিক ভাবধারাকে পরাজিত করে যাবেন, তা একপ্রকার নিশ্চিতই ছিল। তাই দেখা গেল ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের পাতায় জ্বলজ্বল করছে এক অহৈতুকী কৃপালাভের আনন্দঘন দিন— কল্পতরু উৎসব। ভারতবর্ষ আপন সৌকর্যে অতিক্রম করছে সাম্রাজ্যবাদের চিহ্নমাখা দিনগুলি।

কল্পতরু উৎসব কেন তাৎপর্যপূর্ণ? কারণ এটি খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের প্রথমদিন, বড়দিন থেকে শুরু হওয়া উইন্টার ফেস্টিভালের এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। ইংরেজি বর্ষবরণের দিন। আর প্রথমদিনেই কলোনিয়াল ফেস্টিভাল 'বোল্ডআউট' হয়ে গেল হিন্দুয়ানির পবিত্র ছোঁয়ায়। রক্তপাতহীন নীরব এক আধ্যাত্মিক যুদ্ধ। এরই নাম স্পিরিচুয়াল রেভেলিউশন। এটা যে কত বড়ো জয়, তা যতই সময় পেরোবে, ততই অনুভূত হবে।

একজন কেতাবি বুদ্ধিহীন গ্রাম্যযুবক কী করে লাভ করেছিলেন শাস্ত্রবিচারের অনন্য ভাণ্ডার? কী করে পেয়েছিলেন অনন্ত অমৃতলোকের চাবিকাঠি? দুই কাঁধে বিবেক-বৈরাগ্যের ঝোলা নিত্য ঝুলিয়ে রাখতেন কীভাবে? গীতার জ্ঞানযোগের ষষ্ঠশ্লোকে আছে— 'আমি জন্মরহিত, আমার চিন্ময় শরীর যদিও অব্যয়; যদিও আমি সর্বভূতের ঈশ্বর; তবুও আমি চিন্ময় রূপে আমার অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করি এবং যুগে যুগে আবির্ভূত হই।' ঈশ্বরের এই আবির্ভূত সত্তাই হলেন অবতার। তিনি 'কর্মহীন', অর্থাৎ কর্মফলের জন্য তাঁকে ধরাধামে আসতে হয়েছে তা নয়। তিনি কৃপা করেই আসেন, মানব কল্যাণের জন্যই আসেন এবং মানুষের দেহ ও মন নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। কোনো মায়াডোর তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে না। তিনি মায়াধিপতি। পুণ্যাত্মা সাধক আর অবতার অভিন্ন পদবাচ্য নয়। ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরের ভরা নাটমঞ্চে পণ্ডিতদের মাঝখানে যেদিন প্রমাণ-সহ শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন, সেদিনও কি সমকাল বুঝেছিল তাঁর সংজ্ঞা, স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য? বুঝল তখনই যেদিন তিনি নিজে আত্মপ্রকাশ করলেন। অভয় দান করলেন। যেদিন অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু হয়ে, পতিতপাবন রূপে শীতের এক বিকেলে নিজেকে অনাবৃত করলেন। ভক্তরা দেখতে পেলেন অবতারের রূপমাধুরী— 'মনে হয় অঙ্গবাস সব দিয়া খুলি। নয়ন ভরিয়া দেখি রূপের পুতুলি।' সেটা ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি। কলকাতার কাশীপুর উদ্যানবাটি। যেদিন তিনি অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও ভক্তমণ্ডলীর কাছে অভাবনীয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করলেন।

এই কল্পতরু লীলাকাহিনি নানান গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন স্বামী সারদানন্দ রচিত 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এ, কবি অক্ষয়কুমার সেন বিরচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'-তে, শ্রীম কথিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-এ। স্বামী অভেদানন্দ রচিত 'আমার জীবনকথা' গ্রন্থের বিবরণ কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন গলায় দুরারোগ্য কর্কটরোগে আক্রান্ত। সেদিন অফিস ছুটির দিন। বিকেলে বাগানবাটিতে এসেছেন গিরীশ ঘোষ-সহ গৃহস্থ ভক্তরা। সেবক-পার্ষদরাও রয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এদিন কিছুটা সুস্থ অনুভব করে দোতালা থেকে নীচে নেমে বাগানে হাঁটছেন। এরই মধ্যে গিরীশ ঘোষের সঙ্গে কথা হলো। ঐশী সংলাপে ঠাকুর বাহ্যজ্ঞানশূন্য হলেন। ভাবাবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। সংজ্ঞা লাভ করে সবাইকে আশীর্বাণী দিলেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক।' সকলকে স্পর্শ করলেন, তাদের অধ্যাত্ম-আঁখি খুলে দিলেন, সকলের সকল প্রার্থনা পূরণ করলেন।'' ভাই ভূপতি সমাধি প্রার্থনা করিয়াছিল। তাহাকে শ্রীশ্রীঠাকুর কৃপা করিয়া বলিয়াছিলেন, ' তোর সমাধি হবে'। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত গরিব অবস্থায় অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছিলেন বলিয়া অর্থ প্রার্থনা করিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে কৃপা করিয়া বলিলেন, 'তোর অর্থ হবে।' রামলালদাদা, বৈকুণ্ঠ সান্যাল প্রভৃতি গৃহস্থ-ভক্তদিগকে তাহাদের যাহা যাহা প্রার্থনা ছিল, তাহা তিনি আশ্বাস দিয়া 'পূর্ণ হবে' বলিয়া কৃপা করিলেন।''

ঔপনিবেশিক শাসনে থাকবার পর মানুষ স্বভাবতই তাদের শাসনের প্রতি আকৃষ্ট হয়, নতুবা নানান মত ও পথে তা অতিক্রম করতে মনস্থ হয়, কখনো কখনো ঔপনিবেশিক শক্তির মান্য ধর্মকে তীব্রভাবে অস্বীকার করার মানসিকতা জন্মায়। ব্রিটিশ শাসনে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের হয়তো সেই ধর্মীয় পরিমণ্ডল অতিক্রম করার জন্য তাদের প্রথম দিনটিকেই গ্রহণ করেছিলেন। আর সেই দিনটির মধ্যে হিন্দুধর্মের নবযুগের ইতিহাস রচনা করতে চাইলেন। তাঁর এক শিষ্যও তাঁকে অনুসরণ করলেন। ২৪ ডিসেম্বর 'ক্রিসমাস ইভ' হয়ে গেল 'ত্যাগব্রত দিবস'।

১৮৮৬ সালের বড়দিনের পূর্বসন্ধ্যায় (১৩ই পৌষ,১২৯৩) নয়জন গুরুভাই হুগলীর আঁটপুর গ্রামে বাবুরাম ঘোষের (শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ, পরবর্তীকালে স্বামী প্রেমানন্দ) বাড়িতে উপস্থিত হয়ে ভারতের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কল্যাণে সন্ন্যাস গ্রহণে সংকল্প করলেন। অন্যদিন্য তো করতে পারতেন, কারণ আঁটপুরে তার কয়েকদিন আগেই তিনি পৌঁছেছিলেন। মনে রাখতে হবে, ১৮৮৬ সালের আগস্ট মাসেই ঠাকুরের শরীর যায়। সেদিন অশ্বত্থতলায় ধুনি জ্বেলে তাঁরা বসলেন

গভীর ধ্যানে, ঈশ্বর আলোচনা করলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা ১৮৯২ সালের ২৫,২৬, ২৭ ডিসেম্বরের। স্থান কন্যাকুমারী। আবারও ২৫ ডিসেম্বরকে ব্যবহার করলেন স্বামীজী। তিনি অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, ডাইনে-বামে-পশ্চাতে ঢেউ আর ঢেউ, অগণিত অনন্য; মহাসাগরের বুকে মিশে যেতে চায় সাগর আর উপসাগর—অনাদিকাল থেকে তাদের অভিসার যাত্রা। ১৮৯২ সালের ২৫ ডিসেম্বর; আকাশের এক তারা এসেছেন মর্ত্যসাগরের ত্রিকোণ প্রেমের জলধারায় নীলকর দিয়ে। সুনীল জলধি থেকে সন্তানসম ভারতবর্ষের আবির্ভাব; মহাকালের সেই মহান অধ্যায় দেখতে এসেছেন সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক আশ্চর্য নক্ষত্র; তার অতীত আর ভবিষ্যৎ মেলাবেন সমাধিতে বসে। পাশেই সমুদ্রতনয়া কন্যাকুমারী। বড়দিনই বটে, তার প্রাক্কালে পায়ে হেঁটে কন্যাকুমারী পৌঁছেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তারপর মূল ভূখণ্ড থেকে সাগরসঙ্গমে পাঁচশো মিটার সাঁতার দিয়ে ভারত ভূখণ্ডের শেষবিন্দুতে পৌঁছলেন তিনি; তারপর অতুল্য কিন্তু অভুক্ত ভারতের জন্য গ্রহণ করলেন এক আধ্যাত্মিক সংকল্প। ধ্যানের শঙ্খনাদে একাদিক্রমে তিনদিন কাটলো—২৫,২৬, ২৭ ডিসেম্বর। যে খ্রিস্টমত মানুষকে পাপী বলে, সেই মতের প্রতিবাদ কেবল স্বামীজীই করেননি, করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবও। মানুষ দেবতা, মানুষ ব্রহ্ম; সে পাপী হবে কীভাবে? সে অমৃতের সন্তান, সে পবিত্র, সে পূর্ণ; পূর্ণতা প্রাপ্তির সব যোগই তার মধ্যে আছে।

খ্রিস্টধর্মকে অতিক্রম করে যাওয়ার উৎসব কীভাবে অযাচিতভাবে শুরু হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রণব কন্যা সঙ্ঘ, যার প্রধান কার্যালয় হৃদয়পুর, উত্তর ২৪ পরগনা। তাদের সন্ন্যাসিনী, ব্রহ্মচারিণী, সভ্যাবৃন্দ ২০২২ সালের ২৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু করেছিলেন ত্রিপঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসব ও ধর্মসংস্কৃতি সম্মেলন। চলেছে ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত। কর্মসূচিতে ছিল আচার্যবরণ, শোভাযাত্রা, ভাগবতপাঠ, প্রতিষ্ঠাদিবস পালন, মাতৃ আলোচনা, শিক্ষা সম্মেলন ও ধর্ম-সংস্কৃতি সম্মেলন। একইভাবে ২১ থেকে ২৫ ডিসেম্বর ২০২২, শ্রীমদ্ দুর্গাপ্রসন্ন পরমহংসদেব প্রতিষ্ঠিত শ্রীগুরু সঙ্ঘের পাইকপাড়া আঞ্চলিক সঙ্ঘের ৫১তম বর্ষের শুভমিলন সম্পন্ন হয়েছে নানান ধর্মীয় আচরণ পালনের মাধ্যমে। তাদের ভক্তবৃন্দ শোভাযাত্রা সহকারে আচার্যদেবের প্রতিকৃতি ও পাদুকাযুগল উৎসবমণ্ডপে এনেছেন, সঙ্ঘপতাকা উত্তোলিত হয়েছে, হয়েছে স্বস্তিবচন পাঠ, ঠাকুরকে মালা চন্দনে বরণ, ৫১টি প্রদীপ প্রজ্বলন করে শুভ সূচনা এবং সমবেত প্রার্থনা। ছিল গীতাপাঠ, লীলাকীর্তন, বস্ত্রদান, মাতৃসঙ্ঘের অধিবেশন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বিতরণ, নগর সংকীর্তন, ভোগরাগ, ভোগারতি এবং মহতী ধর্মসভা। এইভাবে নানান সংগঠন কিন্তু তাদের মতো করে ঔপনিবেশিক প্রভাব থেকে ভক্তমণ্ডলীকে সমবেতভাবে অতিক্রম করিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

হিন্দু সমাজের দ্বারা তুলসীপূজনের আয়োজন এমনই একটি অতিক্রমণের উদ্যোগ। তুলসী Ocimun sanctum (ইংরেজি প্রতিশব্দ Basil) Lamiaceae পরিবারভুক্ত একটি উদ্ভিদ; ভারতীয় সংস্কৃতিতে তা নারায়ণের সমমর্যাদায় পূজিত। হিন্দু নারীরা পারিবারিক মঙ্গলের জন্য চৈত্র সংক্রান্তি থেকে টানা একমাস তুলসীমঞ্চে তুলসীধারার ব্যবস্থা করেন। একটি মাটির হাঁড়ির তলায় ফুটো করে, তাতে পলতের কাপড় প্রবেশ করিয়ে অতি ধীর ধারায় সেচের বন্দোবস্ত করেন তাঁরা। একে বিন্দুপাতি সেচ বলা যেতে পারে, ইংরেজিতে Drip Irrigation। হিন্দুনারী যে বসুধারা ব্রত পালনের অঙ্গ হিসেবে স্নান সেরে সেই ঝারায় জল ঢালেন এবং তুলসীপূজা করেন তাও তুলসী নামক এক পবিত্র ও ভেষজ উদ্ভিদের প্রতি ধন্যবাদাত্মক চিন্তন। বঙ্গনারী আবৃত্তি করেন— 'তুলসী তুলসী নারায়ণ, তুলসী তুমি বৃন্দাবন। তোমার শিরে ঢালি জল, অন্তকালে দিয়ো স্থল।' যেন জীবনকালে এ এক মহার্ঘ্য ভেষজ আর অন্তিমকালেও জীবনের মায়াজাল থেকে মুক্তির মহৌষধি। বাঙ্গলার ব্রতেও তার পুণ্যপূজন। কবি অক্ষয় কুমার বড়াল তাঁর এষা কাব্যগ্রন্থে লিখেছেন, '' তোমার নিঃশ্বাসে, সর্বরোগ নাশে, যায় দুঃখ পলাইয়া।" নানান ব্যাধিতে বনবাসী কৌমসমাজ তুলসীর ব্যবহার করে থাকে; কখনো এর ব্যবহার সর্দিকাশিতে, কখনো লিউকোডার্মা-র চিকিৎসায়, কখনো দাঁতের ক্ষত নিরাময়ের জন্য, কখনো-বা ম্যালেরিয়াঘটিত জ্বরনাশক রূপে। এই পবিত্র উদ্ভিদ পূজনের দিনে প্রতিটি হিন্দুর গৃহে তুলসীর প্রতিষ্ঠা এবং সেই গাছটিকে কেন্দ্র করে এক-দুই বর্গমিটার পরিমিত স্থানে কিছু ভেষজ উদ্ভিদ লাগানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রস্তাব করা যেতেই পারে, যেখানে তুলসী ছাড়াও এক-দুটি কালমেঘ, ঘৃতকুমারী, কিছু মহাভৃঙ্গরাজ, ব্রাহ্মী, বচ, পিপুল, পুদিনা, সাদা নয়নতারা প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় ভেষজ উদ্ভিদের একটি ছোটো উদ্যানখণ্ড (Sacred Groove) নির্মিত হোক। নিত্য সন্ধ্যায় তাতে প্রদীপ বা বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসন করতে শামিল হোক ভারতীয় নারীকুল। এই সদিচ্ছা নিয়ে তুলসীপূজনের ভাব আয়োজন। ভারতীয় সংস্কৃতি সুরক্ষিত থাকুক তুলসী-সংস্কৃতির সামীপ্যে সান্নিধ্যে। এটাই অতুল্য ভারত চাইছে।

'দেশের মাটি কল্যাণ মন্দির'-এর উদ্যোগে বিশ্বের সমগ্র হিন্দু সমাজের কাছে তুলসীপূজনের আহ্বান জানানো হয়েছে। বাঁকুড়ার ছাতনায় এবং নদীয়া জেলার রাণাঘাটে ঘটা করে অনুষ্ঠিত হয়েছে তুলসীপূজন দিবস। গরিব মানুষদের শীতবস্ত্র দান, মিষ্টিমুখ করানো প্রভৃতি সাংস্কৃতিক আবহ সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। সেই সঙ্গে দেশের মাটির সদস্যরা তাঁদের নিজ নিজ বাসস্থানে, গ্রামে, পাড়ায়, প্রতিষ্ঠানে করেছেন তুলসীপূজনের আয়োজন। প্রকৃত অর্থে এটাই বড়দিন। হিন্দু সংস্কৃতির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে উপকারী ও ঐশী উদ্ভিদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। □

মার্তিনেসের দুটো হাতেই বন্দি হলো বিশ্বকাপ

নিলয় সামন্ত

দিদিয়ের দেশঁ অধিনায়ক হিসেবে দেশকে প্রথমবার বিশ্বকাপে জয়ের স্বাদ এনে দেন ১৯৯৮ সালে। বিশ বছর পর ২০১৮ সালে কোচ হিসেবেও তিনি দেশকে বিশ্বকাপ এনে দেন। এবারও তিনিই কোচ ছিলেন। কিন্তু হয়তো-বা তাঁরই ভুলে এবার বিশ্বকাপ হাতছাড়া হয়ে গেল ফ্রান্সের।

কাতারে বিশ্বকাপ ফাইনালে দেশঁ তাঁর প্রধান অস্ত্র কিলিয়ান এমবাপেকে শুরুতে হয়তো ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেননি। তাঁকে বোতল বন্দি করে রেখেছিল আর্জেন্টিনা। এমবাপের প্রধান অস্ত্র প্রান্ত ধরে দৌড়। যে গতিতে তিনি দৌড়ন তার সঙ্গে একমাত্র উসেইন বোল্টের দৌড়ের তুলনা হয়। সেই দৌড় বন্ধ করার জন্য মোলিনা ও ম্যাক অ্যালিস্টারকে রেখেছিলেন আর্জেন্টিনার কোচ লিয়োনেল স্কালোনি। ফলে বারবার আটকে যাচ্ছিলেন তিনি। ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশঁ অলিভিয়ের জিহুকে তুলে নেওয়ায় প্রধান স্ট্রাইকারের ভূমিকায় চলে যান এমবাপে। ফলে আরও বেশি নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। প্রথমার্ধে মাত্র একবার আর্জেন্টিনার বক্সে ঢুকতে পেরেছিলেন এমবাপে।

কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে এমবাপে নিজের পছন্দের জায়গায় খেলা শুরু করতেই ভয়ংকর হয়ে উঠলেন। বক্সের মধ্যে ওটামেন্ডি ফাউল করায় পেনাল্টি পায় ফ্রান্স। জোরালো শটে গোল করেন এমবাপে। দু'মিনিট পরেই বক্সের মধ্যে থেকে ডান পায়ের দুরন্ত শটে ফ্রান্সের হয়ে দ্বিতীয় গোল করেন এমবাপে। চলন্ত বলে তিনি যে শট মারলেন তা এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা গোল। নির্ধারিত সময়ের শেষ ১০ মিনিটে এগিয়েও যেতে পারত ফ্রান্স। এমবাপের জোরালো শট একটুর জন্য বাইরে বেরিয়ে যায়। অতিরিক্ত সময়ে মেসির গোলে আর্জেন্টিনা আবার এগিয়ে গেলে মনে হচ্ছিল ফ্রান্সের হার নিশ্চিত। কিন্তু তখনও মাঠে ছিলেন এমবাপে। বক্সের বাইরে থেকে গোল লক্ষ্য করে শট মারেন তিনি। বক্সের মধ্যে সেই বল পারেদেসের হাতে লাগায় পেনাল্টি পায় ফ্রান্স। আরও একবার পেনাল্টি থেকে গোল করেন এমবাপে। টাইব্রেকার থেকে এমবাপে আবার গোল করলেও তাঁর দলের দুই সতীর্থের শট বাঁচিয়ে দেন এমিলিয়ানো মার্তিনেস। শেষ পর্যন্ত চোখের জলের বিশ্বকাপ ছাড়তে হলো তাঁকে।

২৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে মেসির গোল। দেম্বেলে পেনাল্টি বক্সের মধ্যে ফাউল করেন মারিয়াকে। রেফারির সিদ্ধান্ত কোনও ভুল ছিল না। তার চেয়েও বড়ো ব্যাপার ছিল, শট নিতে যাওয়ার আগে মেসির এক মুহূর্তের জন্য চোখটা বন্ধ করা। নিজে ফুটবল খেলেছি বলেই জানি, ওই সময় জীবনের সমস্ত নেতিবাচক ঘটনাগুলো মাথায় এসে ভিড় করে। প্রথম গোল পায় আর্জেন্টিনা। লরিসকে বিভ্রান্ত করে বল জালে জড়িয়ে দিল।

৩৫ মিনিটের গোলটাও এল সেই মেসির হাত ধরেই। একটা বাঁ পা কতটা ধারালো হতে পারে, ১৯৮৬ বিশ্বকাপে তা দেখিয়েছিলেন দিয়েগো মারাদোনা। আমি নিশ্চিত, এই রাত মেসিও উপভোগ করছেন। দুই ডিফেন্ডারের মাঝখান থেকে মেসির বাঁ পা ঝলসে উঠল। বল গেল জে পলের কাছে। সেখান থেকে দি মারিয়াকে লক্ষ্য করে থ্রু আলভারেজের। ২-০ করেন দি মারিয়া।

অতিরিক্ত সময়ের ১০৮ মিনিটে ঠাণ্ডা মাথায় ফের গোল। নির্ধারিত সময়ে ফল ২-২। অতিরিক্ত সময়ে ফল ৩-৩। তার পরে টাইব্রেকার। এমিলিয়ানো মার্তিনেসের দুটো হাতই তুলে দিল কাঙ্ক্ষিত বিশ্বকাপ।

তবে মেসির স্বপ্নপূরণের রাতে অবশ্যই বলব কিলিয়ান এমবাপের কথা। বিশ্বকাপের ফাইনালে হ্যাটট্রিক করে ম্যাচ থেকে হারিয়ে যাওয়া ফ্রান্সকে ওই তো ফিরিয়ে এনেছিল। ২০১৮ সালের বিশ্বকাপে প্রথমবার খেলতে নেমে চারটি গোল করেছিলেন এমবাপে। এবার তিনি করেছেন ৮টি গোল। বিশ্বকাপে গোলদাতাদের তালিকায় পেলের সঙ্গে যুগ্মভাবে পঞ্চম স্থানে রয়েছেন তিনি। তাঁর ঠিক উপরেই রয়েছেন লিয়োনেল মেসি ও ফ্রান্সেরই জাঁফতে। তাঁদের গোল সংখ্যা ১৩। জার্মানির গার্ড মুলারের রয়েছে ১৪টি গোল। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ব্রাজিলের রোনাল্ডো নাজারিয়ো। তিনি ১৫টি গোল করেছেন। শীর্ষে জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোজে। তাঁর গোলের সংখ্যা ১৬টি।

তাহলে, কাতারের ফাইনালের নায়ক কে মেসি! এমবাপে! নাকি একেবারে পিছনের সারিতে থেকে নিঃশব্দে দেশকে ট্রফি এনে দেওয়া এমিলিয়ানো মার্তিনেস! না কি, তিনজনেই? □

পিতা ও পুত্র

এক যুবক পিতা তাঁর শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে ঘরের বারন্দায় বসেছিলেন। এমন সময় একটা কাক উড়ে এসে তাদের প্রাচীরের উপর

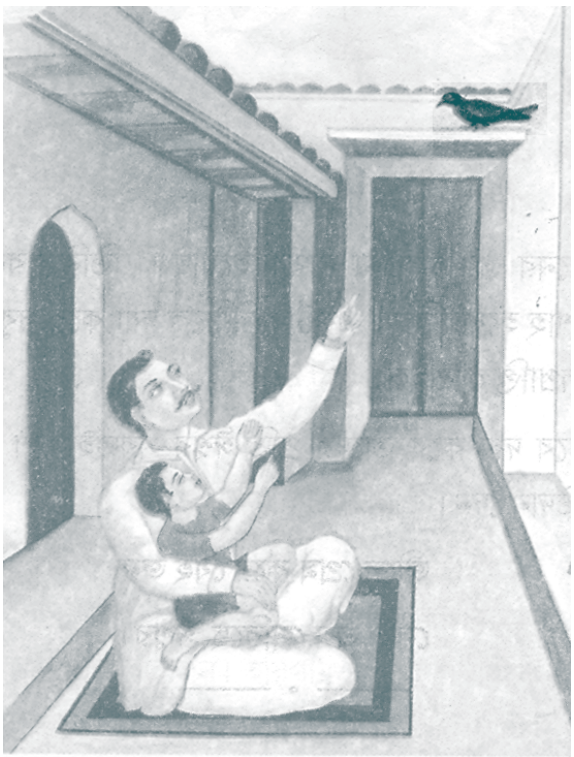

বসল। তাই দেখে ছেলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল,

—বাবা ওটা কী?

বাবা উত্তর দিলেন, ওটা কাক।

একটু পরেই ছেলে আবার জিজ্ঞাসা করল

— বাবা ওটা কী?

বাবা উত্তর দিলেন, ওটা কাক।

ছেলে আবার জিজ্ঞাসা করল, বাবা ওটা কী?

এবারও বাবা একটুও বিরক্ত না হয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে উত্তর দিলেন, ওটা কাক।

এরপর অনেক বছর কেটে গেছে। বাবা এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। ছেলে যুবক হয়েছে। ছেলে এখন খুব বড়ো সরকারি অফিসার। বাবা একদিন বারন্দায় বসে আছেন, এমন সময় বাড়িতে তাঁর ছেলের সঙ্গে কেউ একজন দেখা করতে এসেছে। বাবা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন,

—কে এসেছে রে?

যে এসেছে ছেলে তার নাম বলল।

কিছুক্ষণ আবার একজন দেখা করতে এল। বাবা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আবার কে এল রে?

এবার ছেলে রেগে উঠে বলল, তুমি চুপচাপ বসে থাকতে পারো না? ঘরে তো কিছু করতে হয় না। কে এল, কে গেল তাই নিয়ে সারাদিন ঘ্যানর ঘ্যানর কর কেন?

বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। মাথাটা হাত দিয়ে চেপে ধরে বললেন,

— আমি একবার জিজ্ঞাসা করতেই তুমি রেগে গেলে? তুমি যখন ছোটো ছিলে তখন একই কথা বারবার জিজ্ঞেস করতে আর আমি বারবার তোমার কথার উত্তর দিতাম। যে জিনিস তুমি দেখতে তাই নিয়ে হাজারবার তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে । আমি কোনোদিন বিরক্ত হইনি। আজ তুমি আমার দুটো কথাতেই এত রেগে গেলে?

বাবা হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

ছোট্টো বন্ধুরা, বাবা-মা আমাদের কত আবদার পূরণ করেছেন। আমরা যখন ছোটো ছিলাম আমাদের কত অত্যাচার তাঁরা সহ্য করেছেন। যা দেখতাম তার বিষয়ে হাজার বার প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতাম। কোনোদিন তাঁরা বিরক্ত হননি। শান্তভাবে সব কথার উত্তর দিয়েছেন। বড়ো হয়ে আমাদের এসব ভুলে গেলে চলবে না। মনে রাখতে হবে, আমাদের কোনো ব্যবহার যেন বাবা-মা'র কষ্টের কারণ না হয়ে ওঠে। বাবা-মাকে যেসব ছেলে তিরস্কার করে তাদের লোকে খারাপ ছেলে বলে। তাদের সবাই অপছন্দ করে। নিন্দে মন্দ করে। সবসময় একথা মনে রাখতে হবে, বাবা-মা আমাদের বড়ো করে তুলতে অনেক কষ্ট করেছেন। অফুরন্ত স্নেহ ভালোবাসা দিয়েছেন বলেই আমরা জীবনে বড়ো হতে পেরেছি।

শম্ভুনাথ পাঠক

ভারতের বিপ্লবী

কল্যাণী দাস

কল্যাণী দাস ১৯০৭ সালে কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃভূমি ছিল চট্টগ্রাম। তাঁর বাবা সুভাষচন্দ্রের আদর্শ শিক্ষক বেণীমাধব দাস। তাঁর বোন বীণা দাসও বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। বাবার আদর্শে প্রভাবিত হয়ে দুই বোন বিপ্লবের আদর্শ গ্রহণ করেন। কল্যাণী স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে ছাত্রীসঙ্ঘ গঠন করেন। ১৯৪২ সালে তিনি ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৩২ সালে মুক্তি পান। জেল থেকে বেরিয়ে আবার তিনি বিপ্লবী কাজে মনোনিবেশ করেন। ১৯৮৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি তাঁর জীবনাবসান হয়।

জানো কি?

- ভারতের জাতীয় পাখি ময়ূর।
- পৃথিবীর সবচেয়ে ছোটো পাখি হামিংবার্ড।
- কিউই পাখির পাখা নেই।
- পেঙ্গুইন মানুষের মতো হাঁটতে পারে।
- পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় পাখি মাছরাঙ্গা।
- অনেক উঁচুতে উড়তে পারে ঈগল।
- আর্কটিকটার্ন পাখি একটানা ১১ হাজার মাইল পাড়ি দিতে পারে।
- চিঠি আদান-প্রদান করতে করতে পারে পায়রা।

ভালো কথা

ডাক্তার মহারাজ

আবার নাকি করোনার অন্যরকম ঢেউ আসছে। তা আসুক, আমাদের ভগবান আছেন ডাক্তার মহারাজ। করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউ যখন আছড়ে পড়েছিল তখন আমাদের একমাত্র ত্রাতা হিসেবে কেতকা আশ্রমের ডাক্তার মহারাজই মানুষের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর আশ্রমের তপানন্দ চ্যারিটেবল ডিসপেনসারিতে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের চিকিৎসা করেন তিনি। তিনি কোনো ফি নেন না। যে যা দেয় তাই নেন তিনি। গরিব মানুকে তিনি ওষুধও বিনা পয়সায় দেন। তিনি আমাদের পুরুলিয়ার গর্ব।

গণেশ সিং, একাদশ শ্রেণী, চুনাভাটি, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ল কৌ হ	(১) স স ম্ভ ন্তা বা ন
(২) স্ফা ল আ	(২) ণ ম প মা স রি

১২ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) রামায়ণ (২) দশানন

১২ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) বালিকাসুলভ (২) শান্তিনিকেতন

উত্তরদাতার নাম

(১) আদিত্য চৌধুরী, রাজনগর,কালিয়াচক, মালদা। (২) শালিনী সরকার,৪৫,শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কল-১২ (৩) শিবাংশী পাণিগ্রাহী, মকদুমপুর, ই বি, মালদা। (৪) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

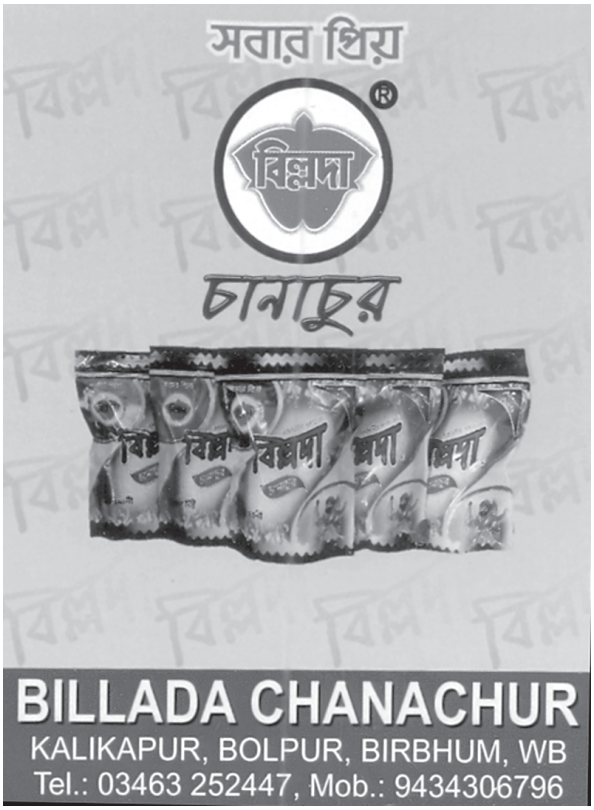

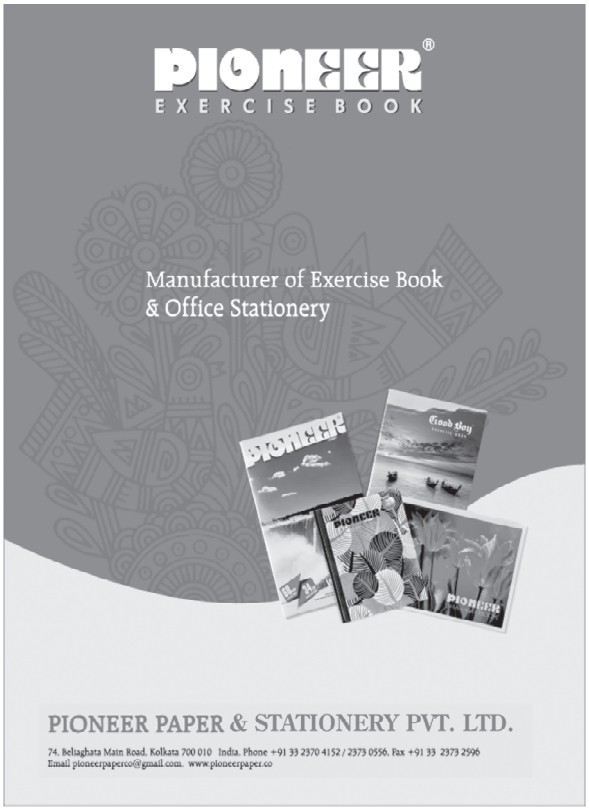

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

ড. আম্বেদকর চেয়েছিলেন ভারত পাকিস্তানের মধ্যে জনবিনিময় হোক

যারা বাবাসাহেব ড. আম্বেদকরের ছবি বুকে চেপে দলিত-মুসলিম ঐক্যের জন্য আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করেন বা যারা নিজেদের সেকুলার বলে গর্ব করে মুসলমানদের পক্ষে কথা বলেন বা যারা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য সংবিধানের দোহাই দেওয়ার জন্য সংবিধান প্রণেতা ড. আম্বেদকরকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন, তারা বাবাসাহেবের Pakistan or the Partition of India বইটি পড়েছেন? না পড়ে থাকলে দয়া করে পড়ে নেবেন।

প্রণব দত্ত মজুমদার

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটা বিষয় খুব লক্ষ্য করা যায়, যেসব রাজনৈতিক দল দলিত ও মুসলমানদের নিজেদের ছাতার তলায় এনে রাজনীতি করতে চায় তারা সবসময়ই তৎকালীন ভারতের দলিত নেতা এবং ভারতের সংবিধান প্রণেতা ড. বি আর আম্বেদকরকে তাদের চতুর ন্যারেটিভের মাধ্যমে একজন হিন্দুবিদ্বেষী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করে এবং সেই ন্যারেটিভের মাধ্যমে দলিত মুসলমান ঐক্য তৈরি করার চেষ্টা করে থাকে। যেহেতু ড. আম্বেদকর একজন দলিত নেতা ছিলেন এবং বর্ণ হিন্দুদের দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়ার কারণে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

এটা ঠিক তৎকালীন ভারতের সামাজিক পরিস্থিতিতে তিনি বর্ণহিন্দুদের বিভিন্ন সামাজিক কুরীতির বিরুদ্ধে, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন এবং হিন্দুসমাজে দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছিলেন। এবং এটাও ঠিক বর্ণহিন্দুদের উপর অভিমানবশত তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি গান্ধীজীর মতো মুসলমানদের মাথায় তুলে নাচার পক্ষেও ছিলেন না এবং দলিত-মুসলমান ঐক্যের সমীকরণের পক্ষেও ছিলেন না। কারণ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ড. আম্বেদকরের ইসলাম সম্পর্কে ধারণা খুবই স্বচ্ছ ছিল। ইসলাম সম্পর্কে সতর্ক বার্তাও তিনি আমাদের দিয়েছিলেন। বাঙ্গলার দলিত (তপশিলি) নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল যখন 'দলিত-মুসলিম ভাই ভাই' বলে মুসলিম লিগকে প্রকাশ্যে সমর্থন করে যাচ্ছিলেন তখন বাবাসাহেব আম্বেদকর বলেছিলেন— 'তপশিলিদের একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তারা হিন্দুদের অপছন্দ করেন বলেই মুসলমানদের বন্ধু বলে মনে করেন। এই চিন্তাধারা ভুল'। ড. আম্বেদকর সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন— 'The realist must take note of the fact that Musalmans look upon the Hindus as Kaffirs, who deserve more to be exterminated than protected.' যা বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'বাস্তববাদীরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন যে মুসলমানরা হিন্দুদের কাফের বলেই মনে করে এবং যাদের রক্ষা করার বদলে মেরে ফেলাই উচিত কাজ হবে বলে মনে করে।' এটি তিনি লিখেছেন তাঁর বই Pakistan or the Partition of India'-র ৯৭ পৃষ্ঠায়। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন দেশ ভাগের অব্যবহিত পরে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে যখন মুসলমানরা হাজার হাজার দলিত ভাই-বোনদের হত্যা করছিল অথবা ধর্মান্তরিত করছিল অথবা বিতাড়িত করছিল।

মুসলমান তোষণকারী সেকুলারবাদীরা আম্বেদকরের ছবি সামনে রেখে দেশের মানুষের সামনে বিশেষ করে মুসলমানদের কাছে যে ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে তা হলো— দেখ দলিত ও মুসলমানদের মসিহা সংবিধান প্রণেতা হিন্দুবিরোধী ড. আম্বেদকার সংবিধানে তোমাদের যা যা অধিকার দিয়ে গেছেন তাতে মনুবাদী হিন্দুরা বাগড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই হিন্দুবাদীরা বাবাসাহেব আম্বেদকরের সংবিধানকেও মান্যতা দিচ্ছে না, তারা বাবাসাহেবকেও অমান্য করে অপমান করছে। এই ভাবে দেশের সাধারণ মানুষের সেন্টিমেন্টকে উসকে দিয়ে মানুষকে উত্তেজিত করার কৌশল করে দলিত ও মুসলমানদের নিজেদের রাজনৈতিক ছাতার তলায় আনার জন্য ধান্দাবাজ রাজনৈতিক দলগুলি ড. আম্বেদকারকে ব্যবহার করেছে। ড. আম্বেদকর যে মুসলমানদের সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করতেন তা এই ভণ্ড সেকুলাররা কখনোই সামনে আনে না। তাঁকে বর্ণ হিন্দু বিরোধী দলিত নেতা হিসেবেই উপস্থাপনা করার চেষ্টা করে ভণ্ড সেকুলাররা।

আসলে ড. আম্বেদকর ভালো করেই বুঝতেন যে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত সমাজ সংস্কার ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের কুপ্রথা ও অস্পৃশ্যতার অবসান একদিন হবেই; কিন্তু ইসলাম যেরকম শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং যেরকম

নিয়ম কানুন তাদের মুসলমান বানিয়ে রেখেছে সেখানে হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থান কিছুতেই সম্ভব নয়, সে উচ্চবর্ণের হিন্দুই হোক অথবা নিম্নবর্ণের। সবাই তাদের কাছে কাফের, তাই ঘৃণার পাত্র ও বধযোগ্য। সেকুলারদের প্রচার কৌশলের জোরে ড. আম্বেদকরের এই মনোভাব মুসলমান বা দলিত কেউই সম্ভবত ভালো করে জানে না, তাই এখনো ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দলিত-মুসলিম ঐক্যের নামে 'জয় ভীম জয় মিম' স্লোগান উঠে।

মুসলমানদের সম্পর্কে ড. আম্বেদকরের ধারণা একদম স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ ছিল এবং হিন্দু-মুসলমান যে একসঙ্গে কখনোই বসবাস করতে পারবে না তা তিনি তাঁর লেখা Pakistan or the Partition of India বইতে একেবারে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। মুসলমানদের সম্পর্কে ড. আম্বেদকরের ধারণা কী রকম পরিষ্কার ছিল তা তাঁর Pakistan or the Partition of India বইটি পড়লেই বোঝা যাবে। ওই বইয়ের Chapter IV-এ তিনি বর্ণনা করেছেন ৭১২ সালে মহম্মদ বিন কাসেমের ভারত আক্রমণ থেকে আরম্ভ করে ঔরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত কীভাবে মুসলমান আক্রমণকারীরা ভারতবাসীর উপর নারকীয় অত্যাচার চালিয়েছে, ভারতে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে, ভারতের সভ্যতাকে তছনছ করে দিয়েছে। Dr. Titus-এর লেখা Indian Islam বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন— 'Qutb-ud-Din Aybak also is said to have destroyed nearly a thousand temples, and then raised mosques on their foundation... he built the Jami Masjid, Delhi, and adorned it with the stones and gold obtained from the temples which had been demolished...'। (p-69).

এখন তো মোটামুটি লেখাপড়া জানা বেশিরভাগ লোকই জানেন ইসলামি শাসনকালে ভারতে অমুসলমানদের জিজিয়া কর দিয়ে অত্যন্ত হীনভাবে তাদের পরিভাষায় জিম্মি বা দিম্মি'র জীবনযাপন করতে হতো। এ ব্যাপারেও বাবাসাহেব ওই বইয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির সময় জিম্মি হিন্দুদের অবস্থা কীরকম ছিল তা বর্ণনা করছেন ওই বইয়ের ৬৩ পৃষ্ঠায়। Dr.Titus-কে উদ্ধৃত করে ড. আম্বেদকার যা লিখেছেন তার বাংলা অনুবাদ এরকম—

সুলতানের দরবারে এক কাজি (অন্য একটি বইয়ে ওই কাজির নাম পেয়েছি— মুঘিসুদ্দিন) এসেছেন। সুলতান কাজির কাছে নিদান চাইছেন কাফের হিন্দুদের প্রসঙ্গে। ইসলামের কানুন অনুযায়ী কীরকম আচরণ বৈধ। কাজি নিদান দিচ্ছেন— 'কোনো Revenue Officer যখন কাফেরদের কাছে জিজিয়া কর আদায় করতে যাবে তখন তারা যদি রৌপ্য চায় তবে কাফেরদের উচিত হবে বিনা প্রশ্নে অত্যন্ত বিনয় সহকারে সম্মান প্রদর্শন করে স্বর্ণ দেওয়া। ওই অফিসার যদি কোনও কারণে রেগে গিয়ে কোনও কাফেরের দিকে নোংরা ছুঁড়ে দেয় তবে কাফেররা অবশ্যই কোনো দ্বিধা না করে মুখ হাঁ করে সেই নোংরা খেয়ে নেবে। তাদের এইভাবে জিম্মি হিসেবে অবদমিত করে রাখতে হবে। হিন্দুদের এইভাবে অপমানিত করে রাখা আমাদের বিশেষ ধর্মীয় কর্তব্য, কারণ হিন্দুরা আমাদের পয়গম্বরের শত্রু। পয়গম্বর তো আমাদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন— কাফেরদের হত্যা কর, তাদের লুণ্ঠন কর, তাদের বন্দি করে রাখ, তাদের ক্রীতদাস করে রাখ, তাদের ধনসম্পদ লুঠ করে নাও, তাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত কর নয়তো মেরে ফেল। তাও তো ভালো— মহান হানিফার অনুগামী আমরা। যার ব্যাখ্যা অনুযায়ী হিন্দু কাফেররা জিজিয়া দিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার পেয়েছে। অন্যমতের অনুসারীরা তো বলেন, 'হয় ইসলাম গ্রহণ কর নয় মৃত্যুবরণ কর।' Dr. Titus বলেছেন— 'The paymant of the Jizyah by the Hindus continued throughout the dominions of the sultans, emperors and kings in various parts of India with more or less regularity—' (ওই বইয়ের পৃ. ৬২)।

দীর্ঘ ৮০০ বছর ধরে ইসলামি শাসনে এরকম জিম্মির জীবনযাপন করেছে হিন্দুরা। স্বাধীন ভারতেও কি হিন্দুদের কোনো আত্মসম্মান বোধ আছে? ধর্মের ভিত্তিতে রীতিমতো দাঙ্গা করে দেশ ভাগ করে নেওয়ার পরেও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবর্ষে দিব্বি তারা সংখ্যালঘুর অছিলায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হিন্দুদের থেকে বেশি অধিকার ও ক্ষমতা ভোগ করছে, সিভিল আইন কানুনের জায়গায় শরিয়া কানুন চলছে। ভারতে ইসলামি আগ্রাসনের যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল সেই ইসলামি শাসকদের নামে নানারকম রাস্তাঘাট, স্টেশন, মসজিদ ইত্যাদি জ্বল জ্বল করছে। হিন্দুদের আত্মসম্মানে তা বাঁধছে না, মুসলমান হলে কবে পরিবর্তন করে ফেলতো। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সাহসে কুলোচ্ছে না ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু করার দাবি জানাবার, যদিও সংবিধানে সেটা চালু করার প্রস্তাবনা রয়েছে। ৮০০ বছর ধরে মুসলমানদের গোলামি করে যে ফিয়ার সাইকোসিস হিন্দুদের মধ্যে তৈরি হয়েছে তাকেই তারা সেকুলারিজম নামক ভণ্ডামির মুখোশে আড়াল করছে।

আমরা হিন্দুরা দেশভক্তির তাড়নায় প্রায়ই দাবি করে থাকি ভারতের মুসলমানরা কেন 'বন্দে মাতরম্' গাইবে না? এদেশে হিন্দুদের থেকে বেশি অধিকার নিয়ে বসবাস করছে তবে এদেশকে মাতৃভূমি মনে করে ভালোবাসবে না কেন? ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী ড. আম্বেদকরের মতে এটা মুসলমানরা

কোনোদিনই করবে না। ড. আম্বেদকর ওই বইয়ের ২৯৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন— 'According to Muslim Canon Law the world is divided into two camps, Dar-Ul-Islam (abode of Islam) and Dar-Ul-Harb (abode of war). A country is Dar-Ul-Islam when it is ruled by Muslims. A country is Dar-Ul-Harb when Muslims only reside in it but are not rulers of it. That being the Canon Law of the Muslims, India cannot be the common motherland of the Hindus and the Musalmans'। 'There is another injunction of Muslim Canon Law called JIHAD (crusade) by which it becomes incumbent on a Muslim ruler to extend the rule of Islam until the whole world shall have been brought under its sway' (page-296)। কাজেই বুঝতে পারছেন? ভারতবর্ষ তো তাদের যুদ্ধক্ষেত্র দার-উল-হারব, যুদ্ধ করে দার-উল-ইসলামে পরিণত করা ওদের পবিত্র কর্তব্য।

কাজেই ভারতবর্ষকে তাদের মাতৃভূমি বা পিতৃভূমি তারা কোনোদিনই মানবে না যতই আমরা প্রেম বিতরণ করি না কেন। ওই বইয়ে ৩০১ পৃষ্ঠায় ড. আম্বেদকর লিখেছেন— 'To the Muslims a Hindu is a Kaffir. A Kaffir is not worthy of respect. He is low-born and without status. That is why a country which is ruled by a Kaffir is Dar-Ul-Harb to a Muslman. Given this, no further evidence seems to be necessary to prove that the Muslims will not obey a Hindu goverment'। এই হলো মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য।

ইসলাম সম্পর্কে না জেনেবুঝেই গান্ধীজী মুসলমানদের প্রেম বিতরণ করে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য একেবারে প্রাণপাত করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে (১৯১৯-১৯২০) তুরস্কে খলিফাতন্ত্রের অবসান হলে ভারতের মুসলমানদের নিয়ে গান্ধীজী খলিফার ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য খিলাফত আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এবং সেই আন্দোলন কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। এই আন্দোলনের ফলেই ভারতের বিচ্ছিন্ন ইসলামি শক্তি গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ছাতার তলায় সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয়।

তারপর থেকে প্রতি বছর ভারতবর্ষের কোথাও না কোথাও হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা লেগেই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত। ড. আম্বেদকর তাঁর ওই বইয়ের ১৪৮ পৃষ্ঠা থেকে ১৮৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ তথ্য তুলে ধরে বলছেন— 'Such is the record of Hindu-Muslim relationship from 1920 to 1940. Placed side with frantic efforts made by Mr. Gandhi to bring about Hindu-Muslim unity, the record makes most painful and heart-rending reading. It would not be much exaggeration to say that it is a record of twenty years of civil war between the Hindus and the Muslim in India, interrupted by brief intervals of armed peace'। (পৃষ্ঠা-১৮৪) গান্ধীজীর নেতৃত্বে এই ছিল ভারতের অবস্থা। পাঠ্য কোনো ইতিহাস বই এসব আপনাকে বলবে না। গান্ধীজীর হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের মূলমন্ত্রই হচ্ছে কেবল হিন্দুদের দোষারোপ করে জ্ঞান দিয়ে যাও আর মুসলমানদের দোষ না দেখে তাদের তোয়াজ করে যাও।

ড. আম্বেদকর লিখেছেন— 'These are not the only things Mr. Gandhi has done to build up Hindu-Muslim unity. He has never called the Muslims to account even when they have been guilty of gross crimes against Hindus.'(পৃষ্ঠা-১৫৬)। এখনো তো নেতাদের মধ্যে এই প্রবণতাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে গান্ধীজী মুসলমানদের মন পেতে এত প্রাণপাত করেছেন সেই গান্ধীজী সম্পর্কে ইসলামের অনুগামী নেতারা কী জঘন্য মনোভাব পোষণ করতো দেখুন।

খিফাফত আন্দোলনের অন্যতম দুই নেতা ছিলেন মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি। যাদের নিয়ে গান্ধী ওই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাদের একজন মহম্মদ আলি, যিনি কিনা আবার ১৯২৩ সালে কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেছিলেন। তিনি ১৯২৪ সালে আলিগড় ও আজমিরে বক্তৃতা দেওয়ার সময় বলেছিলেন— 'মিস্টার গান্ধী যতই পবিত্র চরিত্রবান ব্যক্তি হোন না কেন আমাদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে একজন চরিত্রহীন মুসলমানের চাইতে তিনি নিকৃষ্ট' (পৃষ্ঠা-৩০২)। এই কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে তাকে লক্ষ্ণৌয়ের আমিনাবাদ পার্কে এক মিটিঙে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি ওইরকম কথা গান্ধীজীর সম্পর্কে বলেছেন কিনা? তিনি কোনো দ্বিধা না করে বলেন— 'হ্যাঁ, আমাদের ধর্মের বিচারে একজন চরিত্রহীন অধঃপতিত মুসলমানও মিস্টার গান্ধীর চাইতে ভালো'। এই হচ্ছে হিন্দুদের সম্পর্কে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি।

এরকম ভাবে সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করে ড. আম্বেদকর ওই বইয়ের ৩১৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন— 'Looking back on the history of these 30 years, one can well, ask whether Hindu-Muslim unity has been realized? প্রজ্ঞাবান ড. আম্বেদকর লিখেছেন— 'The history of the last 30 years shows that Hindu-Muslim unity has not been realized...that the pursuit of Hindu-Muslim unity is like a mirage'। ড. আম্বেদকর ঠিকই বলেছেন। যাঁদের ইসলাম নিয়ে কিছু পড়াশোনা করা আছে তারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন হিন্দু-মুসলমানের একতার ধারণা মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাই ড. আম্বেদকর ইতিহাস থেকে তুর্কি ও বুলগেরিয়ার উদাহরণ টেনে এনে পরামর্শ দিয়েছিলেন ভারতভাগ হলে ওইসব দেশের মতো পপুলেশন এক্সচেঞ্জ করে নিলে অর্থাৎ সমস্ত মুসলমান পাকিস্তান চলে যাবে এবং সমস্ত অমুসলমান ভারতে চলে আসবে। এরকম ব্যবস্থা করলে তবেই একমাত্র হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হবে, নচেৎ নয়।

১৯৪৬ সালে ড. আম্বেদকর মুসলমান সম্পর্কে তার এই উপলব্ধির কথা জানিয়েছিলেন Pakistan or the Partition of India বইয়ের মাধ্যমে। আমরা তাঁর লেখা থেকে কোনো শিক্ষাই নেইনি। তাই অনুরূপ পরিস্থিতি আবার তৈরি হয়েছে। যারা বাবাসাহেব ড. আম্বেদকরের ছবি বুকে চেপে দলিত-মুসলিম ঐক্যের জন্য আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করেন বা যারা নিজেদের সেকুলার বলে গর্ব করে মুসলমানদের পক্ষে কথা বলেন বা যারা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য সংবিধানের দোহাই দেওয়ার জন্য সংবিধান প্রণেতা ড. আম্বেদকরকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন, তারা বাবাসাহেবের ওই বইটি পড়েছেন? না পড়ে থাকলে দয়া করে পড়ে নেবেন। ইসলাম সম্পর্কে তাঁর ধারণা কত পরিষ্কার ছিল এবং আমাদের ইসলামের বিপদ সম্পর্কে কত সতর্ক করেছিলেন সেটা বুঝতে পারবেন। □

কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষককল্যাণ মন্ত্রকের প্রচেষ্টা ও সাফল্য

পিআইবি॥ কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষককল্যাণ মন্ত্রকের ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে ওই নির্দিষ্ট অর্থ বছরটিতে মন্ত্রকের মোট বাজেট বরাদ্দ ১,২৪,০০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদনের দিক থেকে দেখতে গেলে জানুয়ারি মাসের গোড়ায় উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যেখানে ৩০৮.৬৫ মিলিয়ন টন, ২০২২-এর ডিসেম্বর মাসে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩১৫.৭২ মিলিয়ন টনে। এই অঙ্কটি এযাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ খাদ্যশস্য উৎপাদনের মাত্রাকে চিহ্নিত করেছে। অন্য এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে বাগিচা ফসল উৎপাদনের মোট পরিমাণ যেখানে ছিল ৩৩১.০৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৪২.৩৩ মিলিয়ন মেট্রিক টনে। দেশের বাগিচা ফসল উৎপাদন ক্ষেত্রেও এটি একটি সর্বোচ্চ মাত্রা বলে জানা গেছে।

খরিফ, রবি এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের মরশুমে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের পরিমাণও বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে বিচার করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে অন্ততপক্ষে ৫০ শতাংশ। এবার আসা যাক ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে। ২০২২-এর গোড়ায় অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে, কুইন্টাল প্রতি ধানের ওপর ধার্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ছিল ২,০১৫ টাকা যা ডিসেম্বর ২০২২-এ বৃদ্ধি পেয়েছে কুইন্টাল প্রতি ২, ১২৫ কোটি টাকায়।

ভোজ্যতেলের (পাম অয়েল) জাতীয় মিশনের আওতায় মোট বাজেট বরাদ্দ নির্দিষ্ট হয়েছে ১১,০৪০ কোটি টাকা। এর ফলে পাম তেল উৎপাদনের লক্ষ্যে অতিরিক্ত ৬.৫ লক্ষ হেক্টর জমিকে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এর মধ্যে ৩.২৮ লক্ষ হেক্টর জমি অবস্থিত দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। আগামী পাঁচ বছরে এই অতিরিক্ত জমিগুলিতে পাম চাষ সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২০২০-২১ সালের শস্য মরশুমে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার মাধ্যমে মোট ৬,৮৩০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের সাহায্যে ডাল ও তৈলবীজ সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১২,১১,৬১৯.৩৯ মেট্রিক টন। এর ফলে ২০২১-২২ সালে উপকৃত হন দেশের ৭, ০৬,৫৫২ জন কৃষক। আবার, ২০২১-২২-এর খরিফ শস্য উৎপাদন মরশুমে জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ডাল ও তৈলবীজ সংগ্রহের মাত্রা ছিল ২,২৪, ২৮২.০১ মেট্রিক টন। এজন্য মোট ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাবদ সরকারের ব্যয় হয় ১, ৩৮০.১৭ কোটি টাকা।

'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ কর্মসূচি'র (পিএম কিষাণ) আওতায় ২০২২-এর জানুয়ারি মাসে ১১ কোটি ৭৪ লক্ষ কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলিতে মোট ১.৮২ লক্ষ কোটি টাকা পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে। অন্যদিকে, চলতি মাসে অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০২২-এ এ পর্যন্ত ২ লক্ষ কোটি টাকা স্থানান্তরিত হয়েছে ১১ কোটি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ কর্মসূচি'টি চালু হয় ২০১৯ সালে।

অন্যদিকে, 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা'র সূচনা হয় ২০১৬-তে। সূচনাকাল থেকে এ পর্যন্ত ২৯ কোটি ৩৯ লক্ষ কৃষকের নাম নথিভুক্ত হয়। তাঁদের মধ্যে ৯ কোটি ১ লক্ষ কৃষককে জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে মোট ১,০৪,১৯৬ কোটি টাকা।

এই প্রসঙ্গে যা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে তা হলো, জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কৃষকরা তাঁদের দেয় প্রিমিয়াম বাবদ জমা করেন প্রায় ২১,৫৩২ কোটি টাকা। এর বিনিময়েই তাঁদের দাবিদাওয়ার নিষ্পত্তি করতে সরকারের ব্যয় হয় ১,০৪,১৯৬ কোটি টাকা।

কৃষিক্ষেত্রে ২০২২-এর জানুয়ারি মাসে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সহায়তার পরিমাণ ছিল ১৬.৫ লক্ষ কোটি টাকায়। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে অপেক্ষাকৃত সহজ শর্তে কৃষকদের অনুকূলে ঋণ সহায়তা মঞ্জুর করার লক্ষ্যে একটি বিশেষ অভিযান শুরু করা হয়। 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ কর্মসূচি'র আওতায় নথিভুক্ত সমস্ত কৃষককেই এর আওতায় নিয়ে আসা হয়। তাঁদের দেওয়া হয় কিষাণ ক্রেডিট কার্ডও। কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের জন্য ২০২২-এর জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ২৯১.৬৭ লক্ষ নতুন আবেদন মঞ্জুর করা হয়।

মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পর্কিত কার্ড বণ্টন কর্মসূচি চালু করা হয় ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে। প্রথম পর্যায়ে (২০১৫-১৭) মোট ১০ কোটি ৭৪ লক্ষ কার্ড বণ্টন করা হয় কৃষকদের মধ্যে। আবার, দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০১৭-১৯) মোট কার্ড বণ্টনের সংখ্যা ছিল ১১ কোটি ৯৭ লক্ষ। অন্যদিকে, 'আদর্শ গ্রামীণ কর্মসূচি'র আওতায় (২০১৯-২০) মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পর্কিত কার্ড বণ্টিত হয় ২৯ লক্ষ ৬৪ হাজার। জমির স্বাস্থ্য ভালো ও অক্ষুণ্ণ রাখতে জৈব সার ব্যবহারের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় এই কর্মসূচিতে। সার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আদেশে ন্যানো-ইউরিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দেশে জৈব কৃষি পদ্ধতির প্রসার ও উন্নয়নে পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনার সূচনা হয় ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে। ২০২২-এর জানুয়ারি পর্যন্ত লক্ষ্যে ৩০,৯৩৪টি ক্লাস্টার বা গুচ্ছ গঠন করা হয় এবং ৬ লক্ষ ১৯ হাজার হেক্টর জমিকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়। সরকারের এই ইতিবাচক পদক্ষেপে উপকৃত হন দেশের ১৫ লক্ষ ৪৭ হাজার কৃষিজীবী মানুষ। ২০২২-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্লাস্টারগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩২, ৩৮৪টিতে। কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছে মোট ৬.৫৩ লক্ষ হেক্টর জমিকে। উপকৃত কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৬ লক্ষ ১৯ হাজারে।

সীমান্তে নজরদারি বাড়ালো ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চীন সীমান্তে নজরদারি বাড়ালো ভারত। দেশের সীমান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সীমান্তে মোতায়েন রয়েছে গরুড় বাহিনী। সেইসঙ্গে নজরদারি পাকাপোক্ত করতে ১৭টি হাই রেজোলিউশন ক্যামেরা কেনার অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সংবাদ সূত্র অনুসারে ২০২০ সালের মে থেকে ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গরুড় বাহিনীকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর বিশেষজ্ঞ অপারেশনের জন্য মোতায়েন করা হয়েছে।

গরুড় কমান্ডোরা চীন সীমান্তে উঁচু এলাকা থেকে চীনা সেনাবাহিনীর ওপর নজর রাখছে। গরুড় কমান্ডো কাশ্মীরে জঙ্গিবিরোধী অভিযান এবং সামরিক ঘাঁটির নিরাপত্তায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত। ভারতীয় বিমান বাহিনী এলএসি বরাবর মোতায়েন করা তার বিশেষ বাহিনীকে আমেরিকান সিগ সাউয়ার অ্যাসলট রাইফেলের মতো আধুনিক অস্ত্র এবং আপগ্রেড করা একে-১০৩ দিয়ে সজ্জিত করেছে। এর সর্বশেষ সংস্করণ একে-২০৩ মেক ইন ইন্ডিয়া স্কিমের আওতায় ভারতেই তৈরি করা হবে। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ডিসেম্বরের শুরুতে অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং সেক্টরে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে ভারত ও চীনা সেনা। প্রায় ৩০০ সেনা নিয়ে তাওয়াঙের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে চলে আসে চীন। তবে ভারতীয় সেনার কাছে হেরে ফিরে যেতে হয় তাদের। ভারতীয় বায়ুসেনার কর্মকর্তারা জানান, পূর্ব লাদাখ থেকে সিকিম এবং অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত চীন সীমান্ত বরাবর সীমান্ত এলাকায় মোতায়েন রয়েছে বিশেষ গরুড় বাহিনী।

সংশ্লিষ্ট এলাকায় তারা প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ অভিযান পরিচালনা করবে। একই সঙ্গে চীনা সামরিক আগ্রাসনের মোকাবিলায় ভারতীয় বিমান বাহিনীকেও ওই এলাকায় তৈরি থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চীনা পণ্য বন্ধে নয়া প্রকল্প কেন্দ্রের

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ চীনা পণ্যের নির্ভরতা কমাতে একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে ভারত সরকার। একই সঙ্গে ভারতে ঘরোয়া শিল্পগুলির ক্ষমতা এবং প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা বাড়ানো হয়েছে বলে রাজ্যসভায় জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী পীযুষ গয়াল। ভারত-চীনা বাণিজ্য সম্পর্ক প্রসঙ্গে তনি জানান, ২০০৩-০৪ সালে চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৩-১৪ সালে তা বেড়ে ৩৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছিল।

তিনি বলেন, 'নিম্নমানের চীনা পণ্যের বৃহৎ বাজার হয়ে উঠেছিল ভারত। গত ২০০৩-০৪ সালে চীন থেকে ভারতের আমদানি অর্থাঙ্ক ছিল ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিপুল পরিমাণ চীনা পণ্য ভারতে আসার ফলে চীন থেকে ভারতের আমদানি ২০১৩-১৪ সালে বৃদ্ধি পায় ৫১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। আমরা এইসময় চীনের ওপর আমাদের নির্ভরতা বহুলাংশে বাড়িয়েছিলাম। ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির জন্য যার ফল ভুগতে হয়েছে দিনের পর দিন।

এখন চীন থেকে আমদানি কমানোর লক্ষ্যে কেন্দ্র সেমি-কন্ডাক্টর ও ২৪টি অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য ১.৯৭ কোটি টাকার পিএলআই স্কিম নিয়ে এসেছে। এর ফলে ভারতে আন্তর্জাতিক মানের পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী পীযুষ গয়াল বলেন, ভারত আগে ১০০ শতাংশ মোবাইল ফোন আমদানি করত। এতদিন মোবাইল উৎপাদেনের মাত্র দুটি কারখানা ছিল ভারতে। কিন্তু পিএলআই স্কিমের ফলে এখন মোবাইল ফোন উৎপাদক ইকোসিস্টেমে দুশোর বেশি সংস্থা রয়েছে। যারা মোবাইল ফোন উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঠামো গড়ে তুলেছে। ভারত এখন বিশ্বে অন্যতম বড়ো মোবাইল ফোন রপ্তানিকারক দেশ। সেই লক্ষ্যে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে মোদী সরকার।

কৃষিক্ষেত্রে দুহাজারের বেশি প্রজাতির শস্য ফলনে সাফল্য

পিআইবি॥ দেশের কৃষিক্ষেত্রে নতুন নতুন ব্যবস্থা ও পদ্ধতিগুলি কাজের লাগানোর জন্য গত তিন বছর ধরে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ (আইসিএআর) এবং জাতীয় কৃষি গবেষণা পদ্ধতি সংস্থা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মাছ-সহ বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের জেনেটিক বিকাশ কীভাবে আরও সফল ও উন্নত করে তোলা যায়, সেই লক্ষ্যেই এই গিশেষ প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন প্রচেষ্টা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ৯ বছরে (২০১৪-২০২২) বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশস্য, ডালশস্য, তৈলবীজ, বাণিজ্যিক শস্যোৎপাদন, বাগিচা ফসল এবং গবাদি পশুর খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে ২,১২২ প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে এবং তা অবশ্যই প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন ও তার সফল প্রয়োগের সুবাদে।

লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে এই তথ্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমর। তিনি জানান, প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষানবিশদের অবহিত করা হয়। দেশের কৃষি বিকাশ কেন্দ্র এবং আইসিএআর সংস্থাগুলির গত তিন বছরে এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ৬২ লক্ষ ৯৯ হাজার কৃষিজীবীকে।

দেউলিয়া বিধিতে বদলের ভাবনা কেন্দ্রের

বিশেষ প্রতিনিধি॥ রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রে ব্যাংক দেউলিয়ার ঘটানায় নয়া বিধি আনার পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র। সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর প্রস্তাবিত বিধিটি আসার পর কোনও ডেভেলপার ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেলেও আবাসন ক্রেতাদের ফ্ল্যাট পেতে কোনও সমস্যা হবে না। এর জন্য সরকারের কেন্দ্রীয় স্তরে ইনসলভেন্সি ও ব্যাংকরাপসি কোড (আইবিসি)-তে যে পরিবর্তন আনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তাতে প্রকল্পভিত্তিক মামলার নিষ্পত্তি হবে। এর ফলে ডেভেলপারের বিরুদ্ধে ব্যাংক দেউলিয়া প্রক্রিয়া চলাকালীনও নির্মিত আবাস ক্রেতাদের হস্তান্তর করার অনুমোদন পাওয়া যাবে।

গত কয়েক বছর ধরে ভারতের রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রে বহু ডেভেলপার ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। অনেকের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর ফলে সবথেকে সমস্যায় পড়েছেন আবাসন ক্রেতারা। জীবনের কষ্টার্জিত আর্থিক সঞ্চয় দিয়ে ফ্ল্যাট বুক করার পরেও তা শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে কিনা, তা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়ছেন অনেকেই। এমনকী, ডেভেলপার ব্যাংক নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণার পর প্রকল্পও অসমাপ্ত থেকে যাচ্ছে। কারণ বর্তমান নিয়ম অনুসারে ডেভেলপারের বিরুদ্ধে দেউলিয়া মামলা হলেই সংশ্লিষ্ট সংস্থার সমস্ত প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়।

২০২২-এর জুন মাস পর্যন্ত ভারতের কর্পোরেট দেউলিয়ার ১,৯৯৯টি মামলার মধ্যে ৪৩৬টিই রিয়েল এস্টেট সংক্রান্ত বলে আগস্টে সংসদে জানিয়েছিলেন কর্পোরেট বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইন্দরজিৎ সিংহ রাও। এধরনের মামলার নিষ্পত্তিতে আইবিসির তেমন সাফল্য এখনও পর্যন্ত নেই। সেই কারণেই রিয়েল এস্টেট ক্ষেত্রের মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা জরুরি বলে জানিয়েছে কেন্দ্র।

তার জন্যই মামলাগুলির নথিভুক্তকরণ, নিষ্পত্তি পরিকল্পনার সরলীকৃত আগাম প্যাকেজ এবং ব্যবসাইক ভিত্তিতে ব্যবহারযোগ্য ও অযোগ্য সম্পত্তিকে আলাদা করে দেখার জন্য পরিকল্পনার সুবিধা-সহ একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম আনার পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র।

শোকসংবাদ

হুগলী জেলার সহ জেলা কার্যবাহ আশিস ভট্টাচার্য গত ২৫ ডিসেম্বর শাখার

বনভোজনে যাওয়ার পথে পথদুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৩২ বছর।

* * *

মালদহ জেলার বৈষ্ণবনগর খণ্ডের দেওনাপুর শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক

জ্যোতিবিকাশ সরকার গত ৯ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি ১ পুত্র, ৫ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নদীয়া জেলার পূর্ণকালীন কার্যকর্তা নরেন্দ্রনাথ পাল গত ২৫ ডিসেম্বর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

স্বস্তিকা

(জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক)

২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬, দূরভাষ : (০৩৩) ২২৪১-০৬০৩, ৫৯১৫

E-mail : swastika 5915@gmail.com

স্বস্তিকা গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান

আশাকরি আপনি শ্রীভগবানের কৃপায় সপরিবারে কুশলে আছেন। আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে গত জন্মাষ্টমী তিথিতে (১৯.০৮.২২) স্বস্তিকা পত্রিকা ৭৪ বছর অতিক্রম করে ৭৫ বছরে পা রেখেছে। গত ২২ আগস্ট স্বস্তিকার ৭৫ বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি দিয়ে ৭৫-এর পথ চলা শুরু হয়েছে। বিগত ৭৫ বছরে বহু বাধানিষেধ সত্ত্বেও পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের সার্বিক প্রচেষ্টায় স্বস্তিকা চলার পথকে অব্যাহত রেখেছে। কোনও কিছুর কাছে মাথা নত করেনি। ব্যতিক্রম শুধু গত করোনা মহামারীর কারণে কয়েক সপ্তাহ ছাপার অক্ষরে আপনাদের হাতে পৌঁছোতে পারেনি।

স্বস্তিকার চলার পথে এই শুভ ৭৫-তম বর্ষটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে উদ্‌যাপনের জন্য একটি স্বাগত সমিতিও গঠন করা হয়েছে। তাঁরাও এক বছরের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ রাখবেন। তারই প্রথম ধাপ হিসেবে আগামী জানুয়ারি ২০২৩-এ ১৮ ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি ৩১ তারিখ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। নিজ নিজ প্রান্তে তারিখ সুনিশ্চিত করে অভিযান করবেন। স্বস্তিকা গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান হাতে নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে তিন বঙ্গের সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা ও বিবিধক্ষেত্রের প্রমুখ কার্যকর্তারা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করবেন। আমরা চাই সমস্ত খণ্ড/গ্রামস্তর পর্যন্ত কমপক্ষে প্রতি শাখায় দশটি (মিলন ও মণ্ডলী-সহ) স্বস্তিকা পাঠকদের কাছে পৌঁছে যাক। সরাসরি হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে স্বস্তিকা দপ্তর। বিশেষত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক আগ্রহী পাঠক আছেন যাঁরা স্বস্তিকা পড়তে আগ্রহী। এমতাবস্থায় বিনীত আবেদন যে সকলে মিলে একযোগে হাতে হাত মিলিয়ে ৭৫ বছরে ৭৫০০০ স্বস্তিকার গ্রাহক সংখ্যা নিশ্চিত করুন।

তিলকরঞ্জন বেরা
সম্পাদক

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ২৬।।

অনেক ঘোরাঘুরির পর কোনোক্রমে একটি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট জোগাড় হলো। কিন্তু প্যারিসে পৌঁছে জাহাজ কোম্পানি আবার তাঁকে বাধা দিল।

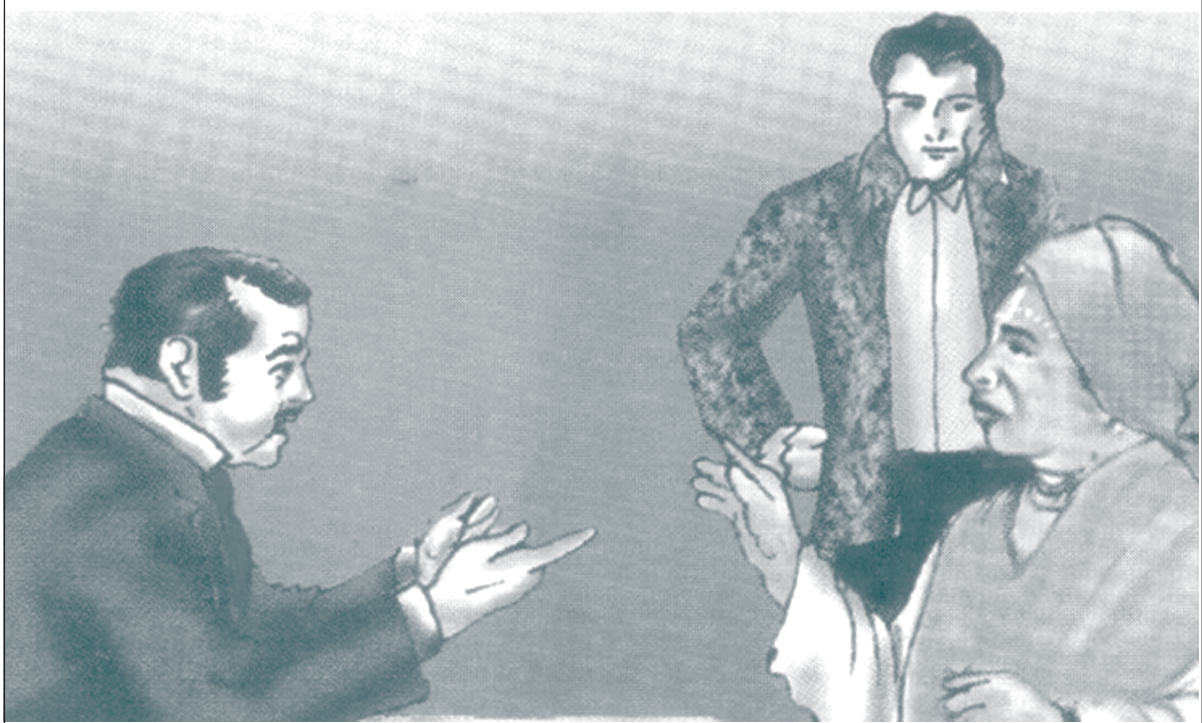

অফিসের এক কেরানি মহানামব্রতজীকে নিয়ে গেলেন কোম্পানির ম্যানেজারের কাছে। ম্যানেজার তো তাঁকে দেখে অবাক। তিনি চিৎকার করে জানতে চাইলেন, এই অদ্ভুত বিচিত্র পোশাক পরে তিনি কোথা থেকে আসছেন?

(ক্রমশ)